শিখন সেতু

ইতিহাস
ভূগোল

নবম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বিশেষজ্ঞ কমিটি।

শিখন সেতু

ইতিহাস

ভূগোল

নবম শ্রেণি

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

মাধ্যমিক স্তরের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয়ের ব্রিজ মেটিরিয়াল 'শিখন সেতু' প্রকাশিত হল। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে - এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ ও সেতু নির্মাণের পাশাপাশি পরিচিতি ও শিখনের মানোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নেবেন এবং 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা ক্রিয়াশীল রাখবেন - এই প্রত্যাশা রাখি। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ডিসেম্বর, ২০২১
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রায় সমস্ত বিষয়ের জন্য 'ব্রিজ মেটিরিয়াল' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে — এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের শ্রেণি-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিখন সামর্থ্যের সংযোগ ও সেতু নির্মাণ। বিশেষত, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটি বহুলাংশেই প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকদের কাছে আমাদের আবেদন, 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি প্রয়োজনীয় কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ার কারণে, এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারবেন। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরেয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০২১
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

শিখন সেতু

ইতিহাস

নবম শ্রেণি

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদন ও বিন্যাস

মহঃ মাসুদ আখতার

বিষয় নির্মাণ

অর্পিতা ভাদুড়ি **ডঃ তন্ময় কুমার ঘোষ** **সঞ্জয় কুমার ধাড়া**

সুজিত কুমার সাহু **নিবেদিতা গাঙ্গুলী** **কাজরী মুখোপাধ্যায়**

সহায়তা

স্নেহাশিস পাত্র

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ইতিহাসের যুগ বিভাজনের ধারণা	১-৩
২.	রাজতন্ত্রের বিবর্তন	৪-৮
৩.	সামন্ততন্ত্র	৯-১২
৪.	ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ	১৩-১৪
৫.	মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট	১৫-১৬
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ১	১৭-১৮
৬.	ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা	১৯-২১
৭.	ঔপনিবেশিক অর্থনীতি	২২-২৪
৮.	ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি	২৫-২৭
৯.	সমাজ ও ধর্মসংস্কার	২৮-২৯
১০.	ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া	৩০-৩৩
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ২	৩৪-৩৫
১১.	জাতীয়তাবাদ ও তার বিকাশ	৩৬-৩৭
১২.	সংবিধান	৩৮-৪০
১৩.	গণতন্ত্রের প্রসার	৪১-৪২
	নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩	৪৩
	শিখন সেতু-র বিষয় প্রসঙ্গে	৪৪

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিশেষত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

ইতিহাসে যুগ বিভাজনের ধারণা

১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের মধ্যে তুলনা ও সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবে।
- বিভিন্ন যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ইতিহাস হলো মানুষের অতীত কাহিনি। যদি আর একটু স্পষ্ট করে বলা যায়, তাহলে মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বা যুক্তিসম্মত জীবন কাহিনিই হলো ইতিহাস। ইতিহাস মূলত বর্তমানের চোখ দিয়ে ও তারই নিরিখে অতীতকে দেখা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগ হচ্ছে একটা দীর্ঘ সময়কাল। এই সময়কালের মাঝে মাঝে কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। তবে এই পরিবর্তনটা হঠাৎ হঠাৎ আসে না। দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে আসে। পরিবর্তন হতে হতে একটা সময় বড়ো আকার ধারণ করে। এই পরিবর্তনের নিরিখে মানবসভ্যতার ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস মিল *History of British India* গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন। হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ—প্রথম দুটি যুগকে তিনি ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করেছেন, আর শেষ পর্বকে ভাগ করেছেন জাতির ভিত্তিতে। ভারতের ইতিহাসের এই যে ত্রি-বিভাজিত যুগ, তা নিয়ে বির্তক রয়েছে। এই জাতীয় যুগবিভাজনের মধ্যে রয়েছে ধর্মসাম্প্রদায়িকতার অন্ধত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠের ঔদ্ধত্য এবং 'অপর'-এর প্রতি বৈরিতা ও বিদ্বেষ। প্রাচীন ভারতের হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকদের পাশাপাশি জৈন শাসক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা বৌদ্ধ শাসক বিম্বিসারের পরিচয় আমরা পাই। একইভাবে মধ্যযুগে মুসলিম শাসকদের পাশাপাশি হিন্দু রাজাদের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়েরও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। আর আধুনিক যুগকে যদি ব্রিটিশ যুগ বলি, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয়দের লড়াইকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হবে না।

স্বাভাবিকভাবেই ভারতের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই বিভাজন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হলে বেশকিছু ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। পলাশির যুদ্ধকে আধুনিক পর্বের মধ্যে ফেলা হলেও বাংলার নবাবী শাসনের বেশকিছু রীতিনীতি মুঘল শাসনের অনুকরণে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মুঘল শাসনকে আবার মধ্যযুগের সীমানার মধ্যে ফেলা হয়। সুতরাং যুগ বিভাজনের ধারণার ক্ষেত্রে প্রতিটি যুগের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে যদি যুগ বিভাগকে মান্যতা দেওয়া হয় তাহলে মানব সভ্যতার সূচনাপর্ব থেকে দিল্লির সুলতানি যুগের শুরুর আগে পর্যন্ত সময়কালকে **প্রাচীন যুগ** বলা যেতে পারে। মধ্যযুগকে দুটি উপপর্বে ভাগ করার প্রবণতা দেখা যায়। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ত্রয়োদশ শতকের সূচনা পর্ব অবধি সময়কালকে **আদি মধ্যযুগ** এবং ত্রয়োদশ শতক থেকে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের শুরু পর্যন্ত সময়কালকে মোটামুটিভাবে **মধ্যযুগ**-এর সীমানার মধ্যে ফেলা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে ভারত **আধুনিক যুগ**-এ পদার্পণ করে।

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক — এই সুপরিচিত ত্রিধাবিভক্ত ঐতিহাসিক কালপরম্পরার কোনও নজির ভারতীয় ঐতিহ্যে নেই। ভারতীয় ইতিহাস চিন্তায় আদি, মধ্য ও অন্তের ধারণা অবশ্যই আছে। সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চায় প্রাচীন যুগটিকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত নির্দেশ করায় অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অনীহা দেখা যায়। এই অনীহা যুক্তিসঙ্গতও বটে। কারণ ভারত ইতিহাসে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহু পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। এই পরিবর্তন কেবলমাত্র রাজবংশের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাজবংশের পালাবদলের মধ্যে দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বদলগুলি চোখে পড়ে।

ইতিহাসের এই যুগ বিভাজনের ধারণা ভারতের মতো ইউরোপ তথা বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে। তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভারতের প্রাচীন যুগ, সপ্তম শ্রেণিতে মধ্যযুগ এবং অষ্টম শ্রেণিতে আধুনিক যুগের কথা পড়েছ। আর নবম শ্রেণিতে পড়বে আধুনিক ইউরোপ। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। এই সময় থেকে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয় বলে গবেষকদের একাংশ দাবি করেন। অবশ্য বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতনের মধ্যে দিয়ে ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। অনেকে আবার ফরাসি বিপ্লবকে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী।

ভারত ও ইউরোপের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা/বৈশিষ্ট্য নীচের ছকে দেওয়া হলো—

যুগ	ভারত	ইউরোপ
(১) প্রাচীন যুগ	• সমাজে বর্ণপ্রথার প্রচলন ছিল। • মেগাস্থিনিসের মতে প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা ছিল না। • মগধকে কেন্দ্র করে প্রথম সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়েছিল।	• দাসপ্রথার অস্তিত্ব ও ক্রীতদাসদের শ্রমের ওপর নির্ভরশীল সমাজব্যবস্থা প্রাচীন ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। • বিভিন্ন জনসমাজ বা অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তারের নীতি বা সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক সূচনা হয় এই পর্বে।
(২) মধ্যযুগ	• সামন্তসমাজের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেলেও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে তা ইউরোপের থেকে আলাদা ছিল। • দিল্লি সুলতানি ও মুঘল যুগে সমাজ, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছিল।	• সামন্ততন্ত্র বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মধ্যযুগের ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। • অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ কর্তৃক পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা কনস্টান্টিনোপলের পতন এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
(৩) আধুনিক যুগ	• ঔপনিবেশিক শাসনে ভারত সমাজ, প্রশাসনিক, শিক্ষাসংস্কার প্রত্যক্ষ করেছিল। • ঔপনিবেশিক শাসনে সম্পদের নির্গমনের মাধ্যমে ভারতের আর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। • ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিদ্রোহ, প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।	• ভূমিকেন্দ্রিক সামন্তসমাজের অবসান ও শিল্প এবং বাণিজ্য-নির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব আধুনিক ইউরোপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। • যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশও আধুনিক ইউরোপের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মনে রাখা জরুরি :

- ইতিহাসে যুগ বা পর্ব বিভাজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।
- পর্ব বিভাজনের মাধ্যমে ইতিহাসের বিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়।
- ভারত ও ইউরোপের যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না।

নমুনা প্রশ্ন

১. নীচে দেওয়া বৈশিষ্ট্য/ঘটনাগুলি ছকের নির্দিষ্ট ঘরে লেখো :

যুগ	ভারত	ইউরোপ
প্রাচীন যুগ		
মধ্যযুগ		
আধুনিক যুগ		

বৈশিষ্ট্য/ঘটনা : সামন্তপ্রথার সূচনা, দাস-নির্ভর অর্থনীতি, পুঁজিবাদের উত্থান, গণতন্ত্রের বিকাশ, সাম্রাজ্যবাদের প্রাথমিক সূচনা, যুক্তিবাদী চেতনার বিকাশ।

২. নিজের ভাষায় লেখো (সাত-আটটি বাক্যে) :

ভারতে ইতিহাসের যুগ বিভাজনের ক্ষেত্রে কেন জটিলতা দেখা যায়? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো?

রাজতন্ত্রের বিবর্তন

২

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান সাম্রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে।
- ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজবংশের ও শাসকের নাম তালিকাবদ্ধ করতে পারবে।

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ার সময় মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত প্রভৃতি রাজবংশ সম্পর্কে জেনেছ। একইভাবে সপ্তম শ্রেণিতে সুলতানি ও মুঘল যুগের বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস পড়েছ। নবম শ্রেণিতে যেহেতু তোমরা ইউরোপের ইতিহাস পড়তে যাচ্ছ, তাই তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজবংশ ও বিখ্যাত সব রাজাদের।

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বযুগে ইউরোপের অনেকগুলি রাজ্যেই বিরাজ করত 'চূড়ান্ত রাজতন্ত্র' (Absolute Monarchy)। ইংল্যান্ডে টিউডর ও স্টুয়ার্ট রাজবংশের সময় শাসকের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় ছিল। ফ্রান্সে বুরবোঁ শাসনেও শক্তিশালী রাজতন্ত্রের প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়েছিল। এ ছাড়াও সমকালীন ক্ষমতাবান রাজবংশগুলির মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখে অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশ, রাশিয়ার রোমানভ বংশ, প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশ, ইতালির স্যাভয় বংশ। প্রত্যেকটি রাজতন্ত্রের প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ, ক্ষমতার প্রয়োগ, শাসন কাঠামো ছিল ভিন্ন।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজবংশ

রাজবংশ	প্রতিষ্ঠাতা	উল্লেখযোগ্য শাসক	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা/বিষয়
মৌর্য	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	অশোক	• ধননন্দকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন লাভ • আলেকজান্ডারের সহকারী গ্রিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের প্রতিরোধ • কলিঙ্গ যুদ্ধ • অশোকের ধর্ম প্রচার
কুষাণ	কুজুল কদফিসেস	কনিষ্ক	• ভারতীয় উপমহাদেশে সোনার মুদ্রার প্রবর্তন • গান্ধার শিল্পের বিকাশ

রাজবংশ	প্রতিষ্ঠাতা	উল্লেখযোগ্য শাসক	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা/বিষয়
সাতবাহন	সিমুক	গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি	• শক-সাতবাহন দ্বন্দ্ব • বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি
গুপ্ত	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	• রূপার মুদ্রার প্রবর্তন • নালন্দা মহাবিহার স্থাপন • অজন্তা গুহাচিত্র • হূন আক্রমণ প্রতিহত করা

এক নজরে দিল্লির সুলতানি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
>yö>œ„ S”y¢V	১৫০৬ থেকে ১৫৭০ !...bÝ¤y ·	„“îv! j ~ xy£î„- £œ“ê!>Ÿ- îy!<ëy- !†ëy¢v! j ~ îœî~
...œ!<	১৫৭০ থেকে ১৩২০ !...bÝ¤y ·	<yœyœv! j ~ ...œ!<- xyœyv! j ~ ...œ!<
¨‡œ„	১৩২০ থেকে ১৪১৭ !...bÝ¤y ·	>£Á¿” !î~ “‡œ„- !Šöîy< Ÿy£ “‡œ„
÷¢ë”	১৪১৭ থেকে ১৪৫১ !...bÝ¤y ·	!...!<î ...y~
öœy!”	১৪৫১ থেকে ১৫৭৬ !...bÝ¤y ·	î£öœyœ öœy!”- !¢„y¨ î öœy!”

এক নজরে মুঘল শাসন

শাসক	সময়কাল	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
îvî¨	1526ô1530 !....	• þ™y!˜þ™öíî ²Ìí› ëöå• xyšþ†y˜ö”î þ™îy!‹“þ „þöî ›‡œ Ÿy¢ö˜î ¢‰˜y • ...y˜ëyî ëöå• îy‹þ™“þ Ÿ!=þî þ™îy‹ë • ‡‡îyî ëöå• xyšþ†y˜ö”î þ™îy‹ë
£›yë¨	1530ô1540- 1555ô1556 !....	• ö‰ï¢yî ëå• ç !îÍ@ìyö›î ëöå• öŸîŸy£ £›yë˜ö„þ þ™îy!‹“þ „þöî˜ • £›yë˜ þ™yîö¢Ä xy×ë ö˜¨ • !¢î!£ö¨î ëöå• ‹ëœy¦þ „þöî £›yë˜ þ™˜îyë ›‡œ Ÿy¢˜ „þyöë› „þöî¨
xv„þîî	1556ô1605 !....	• þ™y!˜þ™öíî !m“þ#ë ëöå• xyšþ†y˜ö”î þ™îy!‹“þ „þöî˜ • £œ!”‡y!Ýþî ëöå• îy’y²Ì“þyþ™ö„þ þ™îy!‹“þ ..þoı • îy‹þ™“þ ˜#!“þ @ìÈ’ „þöî˜ • ”#˜ô£ô£œy!£ ˜yö› ~„þ ˜“þ˜ ›“þy”Ÿ ²Ìî“þ˜ ..þöî˜
‹y£y!A†î	1605ô1627 !....	• îyöîy ¦þ£ëy¢îy !îöoy£# £öë çöàþ˜ • !‰þe!ŸöÒî !î„þyŸ ‡öÝþ
Yy£‹y£y¨	1627ô1658 !....	• îö¨œ...ö¨î !îöoy£ ”›˜ „þöî˜ • ›‡œîy „þy¨y£yöîî çþ™î !˜ësþ’ £yîyë • ›‡œ Þíyþ™“þÄ!ŸöÒî ö×Üþ !˜”Ÿ˜ “þy‹›£œ !˜!›“þ £ë
èîA†ö‹î	1658ô1707 !....	• ‰þR@ìy› î¨î ”...œ „þöî îy,œyö„þ öþ™y“þ!†‹ ‹œ”¢Äö”î xy„þ›ö’î £y“þ öıö„þ îÇþv „þöî¨ • !‹!‹ëy „þöîî þ™˜ƒ²Ìî“þ˜ • !î‹yþ™î ç ö†yœö„þy [þy ”...œ • ”£ ”Ÿö„þî öî!Ÿ ¢›ë ”y!Çþ’yö“þA xîÞíy˜ „þöîç ¢›¢Äyî ¢!àþ„þ ¢›y•yö˜ îÄí £˜

মোঙ্গলগণ
খাইবার গিরিপথ
গজনি
পেশোয়ার
কান্দাহার
শিয়ালকোট
লাহোর
মুলতান
ভাতিন্দা
উছ
দিল্লি
বিজনোর
সেওয়ান
নাগৌর
বদাউন
বহরাইচ
মান্দোর
বায়ানা
কনৌজ
আজমির
গোয়ালিয়র
অযোধ্যা
দেবল
মাহোবা
বারাণসী
চিতোর
কালিঞ্জর
উজ্জয়িনী
ভীলসা
নদীয়া
ভারতে সুলতানি
শাসনাধীন এলাকা
আ র ব সা গ র
বঙ্গোপসাগর

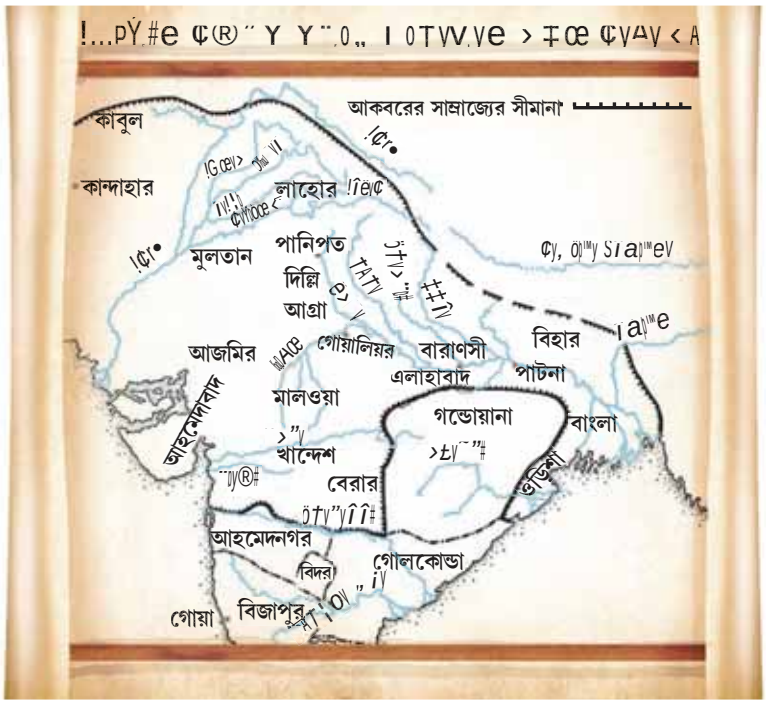
আকবরের সাম্রাজ্যের সীমানা
কাবুল
কান্দাহার
লাহোর
মুলতান
পানিপত
দিল্লি
আগ্রা
আজমির
গোয়ালিয়র
বারাণসী
বিহার
এলাহাবাদ
পাটনা
আহমেদাবাদ
মালওয়া
গন্ডোয়ানা
বাংলা
খান্দেশ
বেরার
উড়িষ্যা
আহমেদনগর
বিদর
গোলকোন্ডা
গোয়া
বিজাপুর

মনে রাখা জরুরি :

- প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৌর্য, কুষাণ, সাতবাহন, গুপ্ত প্রভৃতি।
- মধ্যযুগের ভারতে সুলতানি শাসনের সময় আমরা পাঁচটি রাজবংশের পরিচয় পাই।
- মুঘল আমলে মনসবদারি, জায়গিরদারি প্রথার মাধ্যমে প্রশাসনকে দৃঢ় করা হয়েছিল।
- আকবর রাজপুত নীতি গ্রহণের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্যকে আরও মজবুত করেছিলেন।
- মুঘল শাসকেরা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন।
- ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যনীতি মুঘল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করেছিল।

তোমরা রাজতন্ত্রের বিবর্তন সম্পর্কে ইউরোপীয় প্রেক্ষিতে আরো বিস্তারিত জানবে নবম শ্রেণি প্রথম অধ্যায়: ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক, তৃতীয় অধ্যায়: ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ—রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত, পঞ্চম অধ্যায় : বিংশ শতকের ইউরোপ পড়ার সময়।

নমুনা প্রশ্ন

১. নীচে দেওয়া ঘটনাগুলি ছকের নির্দিষ্ট ঘরে লেখো :

শাসক	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
বাবর	
হুমায়ুন	
আকবর	
জাহাঙ্গির	
শাহজাহান	
ঔরঙ্গজেব	

ঘটনা : !î <y™î ç ö†yœö„y[y ”...œ „öî˜- ”#˜ö£ö£œy!£ ˜yö› ~„ ˜“˜ ›“y”Ÿ ²î“˜ „öî˜-™yîö¢Å xy×ë @£’ „öî˜- ‡‡îyî ëöå• xyšî†y˜ö”î ™îy!<“ „öî˜- ›‡œ Þíy™“Å!ŸöÖî ö×Üî !˜”Ÿ˜ “y<›£œ !˜›y’ „öî˜- îyöîy ¦£ëyîy !¤öoy£# £öë çöàÐ

সামন্ততন্ত্র

৩

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ততন্ত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।

◆ **সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা :**

- প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত ও ইউরোপের অর্থনীতিতে কখনো কখনো এক বিশেষ ধরনের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। এই ধরনের পরিকাঠামোয় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে স্থানীয় শাসকদের হাতেই সবরকম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। সবার ওপরে রাজা থাকলেও রাজস্ব ও শাসনের অধিকার এভাবেই বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাকেই 'সামন্তব্যবস্থা' বা 'সামন্ততন্ত্র' বলে।
- ইংরেজি 'ফিউডালিজম' (Feudalism) শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'সামন্ততন্ত্র'। আবার এই 'ফিউডালিজম' শব্দটির উৎপত্তি হয় লাতিন শব্দ 'ফিওডালিস' থেকে।
- সামন্ততন্ত্র ছিল মূলত এক ধরনের ভূমি ব্যবস্থা। আর তাই সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সময়কালে সমাজে সম্পদ ও ক্ষমতার উৎস স্বাভাবিকভাবেই ছিল জমি।
- এই সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন আরেকজনকে জমি দান করত; যিনি জমি দিতেন তিনি হতেন লর্ড বা প্রভু আর যিনি জমি পেতেন তিনি হতেন ভ্যাসাল বা অধীনস্থ কর্মচারী। এই দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল— তাই 'সামন্ততন্ত্র'।

◆ **ভারতে সামন্ততন্ত্র :**

- ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্যজীবনে সবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মূলত গ্রামেই উৎপাদিত হতো।
- ভারতেও সবার নীচে শোষিত কৃষক, তার ওপরে মাঝারি শাসক, তার ওপরে অল্পসংখ্যক মহাসামন্ত ও সবার ওপরে রাজার অবস্থান ছিল।
- মাঝারি ও মহাসামন্তদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই লেগেই থাকত। কখনো আবার এরাই জোট বেঁধে রাজার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করত।
- শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ই নয়, অনেকসময়ই রাজার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এই সামন্তরা নিজস্ব এলাকার শাসন ও বিচারের ভারও নিজেরাই নিয়ে নিত।
- প্রাচীন ভারতে অনেকসময়ই রাজা বা বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ বা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিষ্কর জমি দান করতেন, যা 'ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। এই ধরনের জমির যাবতীয় অধিকারই চলে যেত জমির প্রাপকের হাতে।

- পাল ও সেন যুগে বাংলার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিকই হয়ে ওঠে। এর মূল কারণ ছিল বাণিজ্যের অবক্ষয়। আরব বণিকদের দৌরাত্ম্যের কারণে বাংলার বণিকরা বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল বলে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবক্ষয় হয় ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতি সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর জন্ম দেয়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের স্তরবিন্যাস

- দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত চোল রাজ্যে রাজা প্রধান থাকলেও রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা মণ্ডলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি প্রদেশের অন্তর্গত গ্রামগুলিকে শাসন করত গ্রাম-পরিষদ বা উর, আবার কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে গঠিত হতো নাড়ু। এই উর ও নাড়ু স্বায়ত্তশাসন, রাজস্ব সংগ্রহ এমনকি বিচারের কাজও করত। রাজার ক্ষমতা এভাবেই বিকেন্দ্রীভূত হয়ে যেত বিভিন্ন স্তরে।

- মধ্যযুগের ভারতবর্ষেও দিল্লির সুলতানরা কখনো কখনো তাঁদের নিজস্ব জমির বাইরে অবস্থিত জমিগুলোকে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ও কর্তব্য পালনের বিনিময়ে তাঁর অধীনস্থদের মধ্যে বণ্টন করতেন। 'ইক্তা ব্যবস্থা' নামে পরিচিত এই প্রথার মধ্যেও সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

◆ **ইউরোপে সামন্ততন্ত্র :**

- মধ্যযুগের ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুগবৈশিষ্ট্য হলো সামন্ততন্ত্র। খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে মূলত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাই ইউরোপের আর্থ-সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

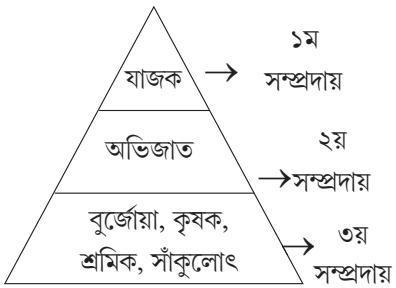

প্রাক্-বিপ্লব ফরাসি সমাজের স্তরবিন্যাস

- ইউরোপে সামন্তসমাজের কাঠামো ছিল ত্রিভুজের মতো। এই সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে ওপরে ছিলেন রাজা, পরবর্তী স্তরে সামন্ত প্রভুরা (ডিউক, ব্যরণ, নাইট প্রমুখ) এবং সবচেয়ে নীচে অবস্থান ছিল সার্ফ বা ভূমিদাসদের।

- ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনে প্রধান ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রাম। এই গ্রামগুলোকে কেন্দ্র করেই ম্যানর-ব্যবস্থা গড়ে উঠত, যেখানে সামন্তপ্রভু তাঁর খাসজমি অধীনস্থ কৃষকদের দিয়ে চাষ করাতেন এবং অতিরিক্ত কর আদায় ও অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন।

- ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সুসজ্জিত ও সুসংবদ্ধ বীর যোদ্ধাশ্রেণি, যারা 'নাইট' নামে পরিচিত ছিল। নাইট যোদ্ধারা সামন্তপ্রভুদের হয়ে নিজ এলাকাকে সবরকম সংকটের হাত থেকে রক্ষা করত।

মনে রাখা জরুরি :

- ইউরোপে মধ্যযুগের একটি বিশেষ ধরনের ভূমিব্যবস্থা হলো সামন্ততন্ত্র।
- সামন্ততান্ত্রিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন।
- সামন্তব্যবস্থা হলো মূলত একটি স্তরবিন্যস্ত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো।

◆ **কিছু সংযোগরক্ষাকারী সূত্র; ভারত ও ইউরোপের সামন্ত্রতন্ত্র**

- সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোয় ভারতের ত্রিভুজাকৃতি সামাজিক স্তরবিন্যাস ও প্রাক্-ফরাসি বিপ্লব যুগে ফ্রান্সের একইরকম সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রকৃতপক্ষে দুই দেশের সমাজেরই আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে চিহ্নিত করে। ভারতের দরিদ্র কৃষকশ্রেণি যেভাবে সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণি দ্বারা শোষিত হতো ঠিক একইভাবে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ তথা তৃতীয় শ্রেণি, উচ্চশ্রেণি (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) কর্তৃক নির্যাতিত হতো।
- ভারত ও ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোয় সবচেয়ে নির্যাতিত ছিল সাধারণ চাষি ও ভূমিদাস বা সার্ফ। এদের ওপর চূড়ান্ত শোষণ শেষ পর্যন্ত এই প্রথাকে অবলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়।
- সামন্ততন্ত্র বিষয়ে তোমরা আরও বিস্তারিত জানবে নবম শ্রেণির প্রাক্কথন অধ্যায়ে।

নমুনা প্রশ্ন

১. **সঠিক উত্তরটি বেছে নেও :**

(ক) সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর অংশ ছিল না—

(i) সামন্ত (ii) রাজা (iii) শিক্ষক (iv) কৃষক

(খ) চোল স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না —

(i) উর (ii) নাড়ু (iii) মণ্ডলম (iv) সুবা

২. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :**

(ক) ব্রহ্মদেয় কী?

(খ) চোল স্বাযত্তশাসন ব্যবস্থার যে-কোনো দুটি এককের নাম লেখো।

(গ) ইক্তা কী?

৩. **নীচের শব্দছকে ফাঁকা জায়গাগুলিতে উপযুক্ত অক্ষর বসিয়ে একটি করে অর্থবহ শব্দ তৈরি করো :**

(i)	সা			প্র	
(ii)		মি			স
(iii)	ম		ল		
(iv)	ব্র		দে		
(v)		ই			

সূত্র :

(i) ভূস্বামী

(ii) বঞ্চিত কৃষকশ্রেণি

(iii) চোল শাসনব্যবস্থার একক

(iv) নিষ্কর ভূমিদান

(v) যোদ্ধাশ্রেণি

৪. **নিচের ছবিটি কি প্রমাণ করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভোক্তা-পৃষ্ঠপোষক (Client-Patron) সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল ছিল? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।**

ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ

৪

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

মধ্যযুগের ভারতে ধর্মীয় সমন্বয়বাদী ভাবনা হিসেবে ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথাগত ধর্মীয় চিন্তাধারাকে ত্যাগ করে ভক্তি ও সুফি সাধকেরা সহজ-সরল জীবনদর্শনের সন্ধান দিয়েছিলেন।

ভক্তিবাদ :

ভক্তিবাদের মূলে ছিল ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালোবাসা বা ভক্তি। এই ভক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি হলো ভগবানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা। অন্যটি হলো ঈশ্বরলাভের জন্য জ্ঞান বা যোগ ছেড়ে ভক্তের ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রথমে দক্ষিণ ভারত এবং পরে উত্তর ভারতের ভক্তিবাদের মূল কথা হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ ভারতে অলভার ও নায়নার সাধকদের মাধ্যমে খ্রিস্টীয় শপ্তম শতকের শুরুতে ভক্তিবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ থেকে ভক্তির এই ধারা পশ্চিম ভারত হয়ে ক্রমশ উত্তর ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামানন্দ, কবীর, নানক, শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন।

ভক্তি দর্শনের মূল কথা ছিল দুটি। একটি হলো কোনো ভেদাভেদ না করে সব মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া। অন্যটি হলো সমস্ত আচার ছেড়ে ভগবানকে নিজের মতো করে পাওয়া।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রচার এবং প্রসার জোরদার হয় শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামী চেষ্টায়। জাত-ধর্ম-বর্ণ এসব ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ভক্তির প্রচার একটা আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সুফিবাদ :

নিজের মতো করে ভগবানকে ডাকার ইচ্ছা কিন্তু হিন্দুধর্মের মানুষদের বা বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় আইনকানুনের বাইরে বহু মুসলমান ঈশ্বরকে নিজের মতো করে আরাধনা করার পথ খুঁজছিলেন। সুফিসন্তরা তাঁদেরকে এই পথ দেখায়।

সুফিদের আর্বিভাব মধ্য এশিয়ায়। আন্দাজ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে তাঁরা ভারতে আসতে থাকেন। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশে সুফিবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকের মতে, সুফি কথাটি আসে *সুফ* থেকে যার অর্থ আরবিতে পশমের তৈরি একটুকরো কাপড়। বিশ্বাস করা হয় যে, এরকম কম্বল-জাতীয় জিনিস গায়ে দিতেন সুফি সাধকরা, খ্রিস্টান সন্তরা এবং সন্ন্যাসীরা।

এদেশে মূলত দুটি গোষ্ঠীর সুফিরা ছিলেন প্রভাবশালী— সুহরাবর্দি ও চিশতি। সুফিদের জীবন ছিল খোলামেলা। তাঁরা ধর্ম, অর্থ, ক্ষমতার মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করতেন না।

মনে রাখা জরুরি :

- ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের ভাবনা ছিল প্রথাগত ধর্মীয় চিন্তাধারার থেকে আলাদা।
- ভক্তি ও সুফি সাধকেরা সহজ-সরল জীবনদর্শনের সন্ধান দিয়েছিলেন।
- কবীর, নানক, চৈতন্যদেব প্রমুখ ভক্তিবাদী ধারার প্রসার ঘটিয়েছিলেন।
- সুফি সাধকেরা সামাজিক ভেদাভেদকে মানতেন না।

নমুনা প্রশ্ন

১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) দুজন ভক্তিবাদী সাধকের নাম লেখো।

(খ) দুটি সুফি সম্প্রদায়ের নাম লেখো।

২. শূণ্যস্থান পূরণ করো :

(ক) ভক্তিবাদের মূলে ছিল ভগবানের প্রতি ভক্তের _____।

(খ) সুফিবাদী সাধকদের আবির্ভাব হয় _____।

(গ) 'সুফ্' শব্দের অর্থ _____।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিনটি-চারটি বাক্যে) :

(ক) ভক্তিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

(খ) সুফিবাদের মূল বক্তব্য কী ছিল?

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

৫

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুঘল সাম্রাজ্য ও শাসনব্যবস্থার সংকটের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিগুলির সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সংঘাতের চরিত্র বর্ণনা করতে পারবে।

মুঘল আমলে মারাঠাদের মতো আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এরা মুঘলদের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে। শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

মারাঠাশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র :

শিবাজি

যুদ্ধপটু মারাঠাদের বাস ছিল পুণে এবং কোঙ্কণ অঞ্চলে। তারা অনেকেই বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডার রাজদরবারে উচ্চপদে ছিল। কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব রাজ্য ছিল না। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে শিবাজি মারাঠাদের জোটবদ্ধ করেছিলেন। শিবাজির ক্ষমতাবৃদ্ধি ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ঔরঙ্গজেব শিবাজিকে দমন করতে শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম এবং রাজা জয়সিংহকে পাঠান। জয়সিংহ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে শিবাজিকে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন।

শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি বড়োসড়ো প্রতিরোধ আন্দোলন। শিবাজি একটি সুপরিকল্পিত এবং স্বাধীন শাসনব্যবস্থার সূচনা করেন। শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে।

শিখশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র :

শিখদের সঙ্গে জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের আমলে মুঘলদের সংঘাত হয়। এই সংঘাতের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। শিখরা তাদের গুরুর প্রতি অনুগত ছিল। তাই নিয়ে অনেকসময় মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে শিখদের সংঘাত বেধে যেত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষের দিকে চতুর্থ গুরু রামদাসের ছেলে অর্জুনদেব শিখদের গুরু হন। এই সময় থেকেই শুরু হলো বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন করা।

নবম শিখ গুরু তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু শুধু ধর্মীয় কারণেই মুঘল-শিখ সংঘাত হয়নি। এ কথাও প্রচলিত যে তেগবাহাদুর এক পাঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাঞ্জাবে মুঘল শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। তেগবাহাদুরকে বন্দি করে মুঘলরা হত্যা করে। এই ঘটনার পর শিখরা পাঞ্জাবের পাহাড়ি এলাকায় চলে যায় এবং সেখানেই দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা নামক একটি সংগঠন তৈরি করেন। খালসার কাজ ছিল শিখদের নিরাপদে রাখা। সামরিক প্রশিক্ষণ শিখদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের 'পন্থ' বা পথ ঠিক করে দেন। গুরু তাদের পাঁচটি জিনিস সবসময় কাছে রাখতে বলেন। এই পাঁচটি জিনিসের নামই 'ক' অক্ষর দিয়ে শুরু। এগুলি হলো—কেশ, কঙ্ঘা, কচ্ছা, কৃপাণ এবং কড়া। এ ছাড়াও খালসাপন্থী শিখরা 'সিংহ' পদবি ব্যবহার করতে শুরু করল।

অন্যান্য বিদ্রোহ :

জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলের জাঠদের সাথে বেশ কয়েকবার সংঘাত বেধেছে। জাঠরা ছিল প্রধানত কৃষক। রাজস্বকে কেন্দ্র করেই মূলত এই সংঘাতের সূচনা হয়। ঔরঙ্গজেবের আমলে তারা জোটবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে।

মথুরার কাছে নারনৌল অঞ্চলে এক দল কৃষক মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এরা ছিল সৎনামি নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

এ সমস্ত বিদ্রোহগুলি আসলে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট :

আকবরের শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদগুলিকে বলা হতো মনসব। আর পদাধিকারীদের বলা হতো মনসবদার। মনসবদারদের দু-ভাবে বেতন দেওয়া হতো — নগদে অথবা রাজস্ব বরাত দিয়ে। রাজস্বের এই বরাতকে বলা হতো জায়গির।

শাহজাহানের সময় থেকেই মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থার সংকট দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই মনসবদারদের পদ অনুযায়ী বেতন দেওয়া হত না। অনেক সময় আবার কৃষক বিদ্রোহের কারণে রাজস্ব আদায় করা যেত না। তাছাড়া দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করাও সবসময় সম্ভব হতো না। ভালো জমিকে ঔরঙ্গজেব খাস জমি বা খালিসা হিসেবে রেখেছিলেন কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য। জায়গির হিসেবে বণ্টনের জন্য এরকম ভালো জমির অভাবও সমস্যাকে জটিল করেছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

মনে রাখা জরুরি :

- মুঘল আমলে আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটে।
- মারাঠারা মুঘলদের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে।
- শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্ক তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছায়।
- শিবাজি মারাঠাদের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করেন।
- গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিখদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) পুরন্ধরের সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

(খ) ঔরঙ্গজেব শিবাজিকে দমন করার জন্য কাদের পাঠিয়েছিলেন?

(গ) কোন শিখ গুরুর সময় থেকে বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন শুরু হয়?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিনটি-চারটি বাক্যে) :

(ক) শিবাজির নেতৃত্বে কীভাবে মারাঠা শক্তির উত্থান ঘটেছিল?

(খ) মুঘলদের সঙ্গে শিখশক্তির কেন সংঘাত বেধেছিল?

৩. নিজের ভাষায় লেখো (সাত-আটটি বাক্যে) :

গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কী কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

নমুনা প্রশ্নপত্র - ১

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি দুটি বাক্যে) :

(ক) 'History of British India' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

(খ) কনস্টান্টিনোপলের পতন কবে হয়েছিল?

(গ) 'দীন-ই-ইলাহি' কে প্রর্বতন করেন?

(ঘ) 'জিজিয়া' করের পুনঃপ্রবর্তন করেন কোন মুঘল সম্রাট?

(ঙ) কোন মুঘল সম্রাট বাংলাকে পোর্তুগীজ জলদুস্যদের হাত থেকে রক্ষা করেন?

(চ) ম্যানর ব্যবস্থা কী?

(ছ) নাইট কাদের বলা হত?

২. নির্ভুল তথ্য দিয়ে নীচের ছকটি পূরণ করো :

যুদ্ধ	বিবাদমান দুটি পক্ষ
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ	
চৌসার যুদ্ধ	
পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	
হলদিঘাটির যুদ্ধ	
ঘর্ঘরার যুদ্ধ	

৩. শূণ্যস্থান পূরণ করো :

(ক) মুঘল সম্রাট _____ রাজত্বকালে বারো ভুঁইয়ারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল।

(খ) বিজাপুর ও গোলকোন্ডা দখল করেন _____।

(গ) ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে _____ সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল।

(ঘ) সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে সবচেয়ে নীচে অবস্থান করত _____।

(ঙ) চোল সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশকে বলা হত _____।

৪. **নীচের দেওয়া শাসকদের নামগুলিকে সময়কালের নিরিখে সাজাও :**

জালালউদ্দিন খলজি

খিজির খান

বহলোল লোদি

সুলতান রাজিয়া

৫. **সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :**

(ক) জেমস মিল কর্তৃক ভারতের ইতিহাসের যুগ বিভাজন নিয়ে কেন বির্তক তৈরি হয়েছে?

(খ) সামন্ততন্ত্র কী?

(গ) ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী ছিল?

(ঘ) ইক্তা প্রথার মধ্যে কী সামন্তপ্রথার বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে ছিল?

(ঙ) ভক্তিবাদের মূল বক্তব্য কী ছিল?

৭. **নিজের ভাষায় লেখো (সাত-আটটি বাক্যে) :**

ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে তুমি কী কোনো আদর্শগত মিল খুঁজে পাও? যুক্তিসহ লেখো।

ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

৬

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের বিভিন্ন নীতিগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ব্রিটিশ শাসনের বিভিন্ন সংস্কারগুলি তালিকাবদ্ধ করতে পারবে।

১৭৫৭ খিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শুরু হয়। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সার যুদ্ধের পর কোম্পানির শাসন দৃঢ়তা লাভ করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে দেওয়ানি বিচার ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে কোম্পানি। শুরু হয় দ্বৈতশাসন। ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষমতাও দখল করবে। শুরু হয় ভারতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এরজন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কয়েকটি আইন প্রবর্তিত হয়। ভারতকে ইংরেজ কোম্পানি তাদের সুবিধার জন্য তিনটি প্রদেশ বা প্রেসিডেন্সিতে ভাগ করে। বাংলা প্রেসিডেন্সি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। প্রথমে তারা বাংলা প্রেসিডেন্সিতে কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

(১) রেগুলেটিং অ্যাক্ট : ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ-এর উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' নামে একটি আইন পাশ করায়, এই আইনের দ্বারা বাংলার দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ এই সময় থেকে বাংলা প্রকৃত অর্থে পরাধীন হয়। বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাংলার কোম্পানির গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি এই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পায়।

(২) পিটের ভারত শাসন আইন : রেগুলেটিং অ্যাক্টের কিছু ত্রুটি দূর করার জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট একটি নতুন আইন প্রবর্তন করেন যা 'পিটের ভারত শাসন আইন' নামে পরিচিত। এই আইন দ্বারা বাংলার গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়।

এরপর ভারতে প্রশাসনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য সরকার পুলিশবাহিনী, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি গড়ে তোলে। সমগ্র ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে হওয়ার পর বিভিন্ন গভর্নর জেনারেলের আমলে নানা সংস্কার প্রবর্তন করে প্রশাসনিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা হয় এবং ভারতবাসীর সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়।

বিভিন্ন গর্ভনর জেনারেলের সময় গৃহীত সংস্কারগুলি তালিকার মাধ্যমে দেখানো হলো :

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস

(১) মুঘল আমলের পুলিশি ব্যবস্থা অনুসরণ।

(২) ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতাতে ইম্পিরিয়াল কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

(৩) ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আইন করে ইম্পিরিয়াল কোর্টের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

(৪) হিন্দু আইনগুলির একটি সারসংকলন তৈরি করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস

লর্ড কর্নওয়ালিস

(১) পুলিশবাহিনী তৈরি।

(২) থানাতে দারোগা নিয়োগ।

(৩) কর্নওয়ালিস **কোড** প্রবর্তন।

(৪) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন।

(৫) সেনাবাহিনীর উচ্চপদে ইউরোপীয়দের নিয়োগ।

(৬) প্রতিটি বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতি হিসেবে ইউরোপীয়দের নিয়োগ।

(৭) ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন।

লর্ড কর্নওয়ালিস

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক

(১) ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ।

(২) ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রবর্তন।

(৩) ঠগি দস্যুদের দমন।

(৪) পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন।

(৫) সতীদাহ নিবারণ আইন প্রবর্তন।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক

মনে রাখা জরুরি :

- ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বেশকিছু আইন পাস হয়।
- ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটের ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়।
- কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকরণ হিসেবে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার পুলিশব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়।

ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সম্পর্কে তোমরা নবম শ্রেণিতে প্রাক্‌কথন অংশে সমুদ্রযাত্রা আর নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার আলোচনায় আরও তথ্য পাবে। নবম শ্রেণিতে চতুর্থ অধ্যায় শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে পড়ার সময় আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার প্রবর্তন কে করেন?

(খ) হিন্দু আইনগুলির সারসংকলন প্রস্তুতির উদ্যোগ কে নেন?

(গ) ঠগি দস্যু দমনে কে উদ্যোগ নিয়েছিলেন?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) কেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করানো হয়েছিল?

(খ) উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক-এর যে কোনো দুটি সংস্কারকার্যের উল্লেখ করো।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি

৭

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ঔপনিবেশিক শাসনে কীভাবে ভারতের অর্থিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ঔপনিবেশিক অর্থ ও সম্পদ আদায়ের মাধ্যম হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসকেরা যে পথগুলি বেছে নিয়েছিল তার তালিকা তৈরি করতে পারবে।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য কৃষকরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যক্তিগত বাণিজ্য ভারতের আর্থিক কাঠামো ভেঙে ফেলে। দ্বৈতশাসনের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে দেখা দিয়েছিল মন্বন্তর। কোম্পানি রাজস্ব আদায়কে নিয়মিত ও সুসংগঠিত করার জন্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : ১৭৯৩ খ্রি. বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় এই বন্দোবস্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চালু হয়। জমির চূড়ান্ত মালিকানা কোম্পানির হাতেই ছিল এবং নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের আগে প্রাপ্য রাজস্ব জমিদারকে জমা দিতে হতো, নতুবা জমিদারের সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার কোম্পানির ছিল। জমিদারেরা চাষিদের থেকে রাজস্ব আদায় করত। এই বন্দোবস্ত কৃষকের স্বত্বকে খারিজ করে। কর্নওয়ালিসের আশা ছিল এর মাধ্যমেই জমিদারদের স্বার্থ ও কৃষির উন্নতি—দুইই নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে জমিদারদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলেও কৃষকের অবস্থার উন্নতি হয়নি।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত : উনিশ শতকের প্রথম পর্বে মাদ্রাজ অঞ্চলে বড়োমাপের জমিদারের অস্তিত্ব তেমন ছিল না। সেই কারণে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাসরি কৃষকের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত করে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এই ব্যবস্থা চালু হয়। ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভাড়াটে চাষি হিসেবে কৃষকদের চাষের অধিকার দেয়। নির্ধারিত হয় যে, সময়মতো খাজনা না দিলে সেই জমি অন্য কৃষককে দিয়ে দেওয়া হবে।

মহলওয়ারি বন্দোবস্ত : 'মহল' অর্থাৎ সমষ্টি এবং তা ছিল গ্রামভিত্তিক। মহলের প্রধান বা জমিদারের সঙ্গে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য করা হতো। সেই কারণে কৃষকেরা মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শরণাপন্ন হতো। ফলে তাদের হাতেই জমিগুলো কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

অবশিল্পায়ন : ভারতে দেশীয় শিল্পের অধঃপতন অবশিল্পায়ন নামে পরিচিত। ঔপনিবেশিক ভারতে সুতিবস্ত্র শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্পানির হাত থেকে বাজারের একচেটিয়া অধিকার চলে যায়। দেশীয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ জীবিকাহীন হয়ে পড়ে। বৈষম্যমূলক প্রতিযোগিতা ভারতের শিল্পের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। ব্রিটেনের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতীয় সুতিবস্ত্র।

সম্পদের বহির্গমন : উপনিবেশ হিসেবে ভারতের সম্পদকে ব্রিটেনে নানাভাবে স্থানান্তরিত করা হতো। নজরানা, উপঢৌকন, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ইত্যাদি নানা মাধ্যমে ভারতের সম্পদ বেরিয়ে যেতে থাকে। দেশের সম্পদ বিদেশে চালান হওয়াকেই 'সম্পদের বহির্গমন' বলে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের অর্থ ও সম্পদকে ব্রিটেনের প্রয়োজনে ব্যবহার করত। ভারতের দারিদ্র্যের পিছনে ঔপনিবেশিক নীতিই দায়ী ছিল।

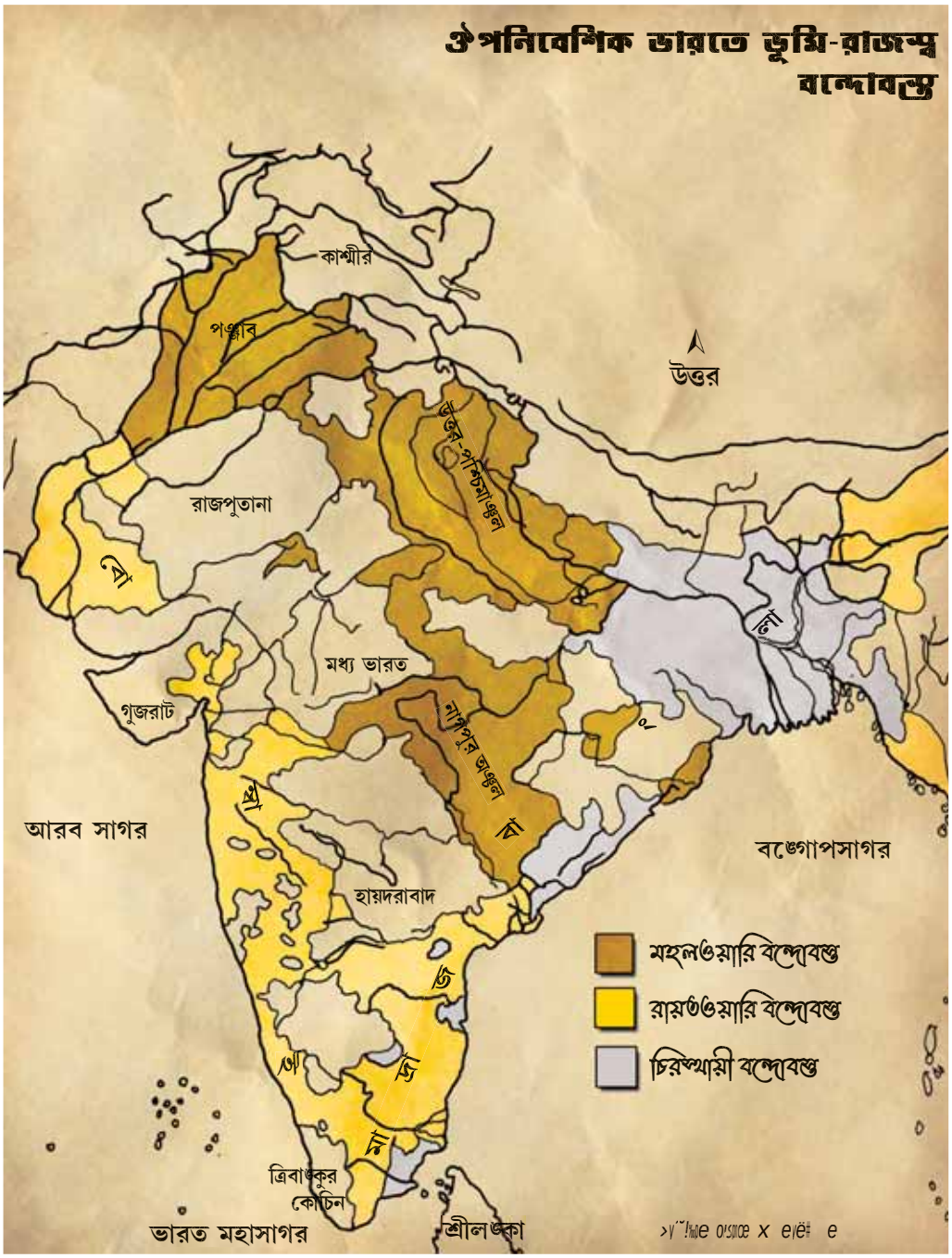
ঔপনিবেশিক ভারতে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত
কাশ্মীর
পঞ্জাব
উত্তর
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
রাজপুতানা
মধ্য ভারত
গুজরাট
নাগপুর অঞ্চল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
হায়দরাবাদ
মহলওয়ারি বন্দোবস্ত
রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
ত্রিবাঙ্কুর
কোচিন
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'রত্ন' : আঠারো শতকের শেষদিক থেকে পরবর্তী দেড় শতকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের অর্থনীতিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পরে বলা হয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার যাবতীয় খরচ ভারত থেকেই আদায় করতে হবে। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে যথেচ্ছভাবে ভারতীয় সম্পদ ব্যবহার করা যাবে। ভারতের বাজার ব্রিটিশ পণ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেনের ল্যাঙ্কাশায়ারে তৈরি সুতির কাপড়ের ৮৫ শতাংশ ভারতে বিক্রি হতো। ভারতীয় রেলের ব্যবহৃত লোহা ও ইস্পাতের ১৭ শতাংশ আসত ব্রিটেন থেকে। অর্থাৎ, উপনিবেশ হিসেবে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অভিমুখ শাসক ব্রিটেনের স্বার্থেই পরিচালিত হতো। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতকেই সবচেয়ে দামি 'রত্ন' হিসেবে বর্ণনা করা হতো।

শিল্পবিপ্লবের পর শিল্পোন্নত দেশগুলি পণ্য বিক্রির বাজারের সন্ধান করতে থাকে। পাশাপাশি বেশকিছু দেশকে তারা কাঁচামাল ও মূলধন সরবরাহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ভারত এই দেশগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম। শিল্পোন্নত দেশগুলি উপনিবেশ দখলের লড়াইতে মেতে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মূল লক্ষ্য ছিল উপনিবেশ থেকে যে-কোনো মূল্যে অর্থ ও সম্পদ আদায় করা। স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, উপনিবেশগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

মনে রাখা জরুরি :

- ঔপনিবেশিক আর্থিক নীতি ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দিয়েছিল।
- সম্পদের বর্হিগমন ব্রিটেনকে স্বচ্ছল করলেও ভারতকে দূর্দশাগ্রস্ত করেছিল।
- অবশিল্পায়ন ভারতীয় শিল্পের ভাঙনকে প্রত্যক্ষ করিয়েছিল।
- ভারত কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশ এবং শিল্পপণ্য বিক্রির বাজারে পরিণত হয়েছিল।

তোমরা ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বিষয়ে নবম শ্রেণির চতুর্থ অধ্যায়ে শিল্পবিপ্লব আলোচনায় আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (একটি বাক্যে) :

(ক) কোন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব ছিল?

(খ) মহলওয়ারি ব্যবস্থায় 'মহল' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

২. ঠিক/ভুল নির্ণয় করো :

(ক) সূর্যাস্ত আইন আমরা রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় পাই।

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল বাংলা প্রদেশে।

৩. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) অবশিল্পায়ন কী?

(খ) সম্পদের বর্হিগমন বলতে কী বোঝো?

ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি

৮

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাসংস্কারের উদ্যোগগুলি বর্ণনা করতে পারবে।
- ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসারের পশ্চাতে ঔপনিবেশিক শাসকদের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করা। প্রথমে তারা ফারসি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা জানা লোকদের কাজে নিয়োগ করে। মুঘল আমলে দরবারি ভাষা ফারসি হওয়ায় বেশকিছু বছর ফারসিকেই প্রাধান্য দেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইংরেজি ভাষা-নির্ভর পাশ্চাত্যশিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে।

ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান :

প্রতিষ্ঠান	সময়কাল	উদ্যোক্তা	উদ্দেশ্য
কলকাতা মাদ্রাসা	১৭৮১ খ্রি.	ওয়ারেন হেস্টিংস	আরবি ও ফারসি ভাষাচর্চা
বেনারস সংস্কৃত কলেজ	১৭৯১ খ্রি.	জোনাথন ডানকান	ওই কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঔপনিবেশিক শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সুগঠিত করবে
হিন্দু কলেজ	১৮১৭ খ্রি.	ডেভিড হেয়ার, এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট	ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো
জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশন	১৮৩০ খ্রি.	আলেকজান্ডার ডাফ	ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো

ঔপনিবেশিক পর্বে শিক্ষা-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ :

- ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনকে দৃঢ় করা।
- ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট (সনদ আইন) ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। এই আইনে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বছরে কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
- ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গড়ে ওঠে। এই কমিটি আরও দুটি সংস্কৃত কলেজ ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়।
- ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি লিখে সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন।
- ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেকলে শিক্ষাসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।
- ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ে।
- ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড শিক্ষাসংক্রান্ত আরেকটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

উইলিয়ম কেরি

ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানা, কলকাতা।

মনে রাখা জরুরি :

- ঔপনিবেশিক শাসকেরা কোম্পানির স্বার্থরক্ষার জন্য এদেশে নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছিল।
- ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনাপর্বে ফারসি, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে প্রাধান্য দেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ।
- ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর পাশ্চাত্যশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে।

নমুনা প্রশ্ন

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম লেখো।

(খ) উইলিয়ম জোনস কেন এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

(গ) জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশন কে কোন উদ্দেশ্যে গড়ে তোলেন?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) শিক্ষার প্রসারে উইলিয়ম কেরি কী ভূমিকা নিয়েছিলেন?

(খ) মেকলের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য কী ছিল?

(গ) উড'স ডেসপ্যাচ-এ শিক্ষাসংক্রান্ত কী কী প্রস্তাব ছিল?

সমাজ ও ধর্মসংস্কার

৯

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মসংস্কারের নানা উদ্যোগ বর্ণনা করতে পারবে।

ঔপনিবেশিক ভারতে সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের একাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসকদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন প্রশাসনিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। অবশ্য সমাজ ও ধর্মসংস্কারের নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক ও দ্বন্দ্বও দেখা দিত।

রামমোহন সতীদাহ প্রথার নিষিদ্ধকরণে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন।

বিদ্যাসাগর বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের জন্য উদ্যোগ নেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে আইন জারি করে বিধবাদের পুনর্বিবাহকে স্বীকৃতি জানানো হয়।

ডিরোজিও অনুগামী ছাত্ররা নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল নামে পরিচিতি পায়। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। জাতপাত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

রামমোহন

বিদ্যাসাগর

ডিরোজিও

পণ্ডিতা রমাবাঈ পশ্চিম ভারতে নারীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ভগিনী শুভলক্ষ্মী মাদ্রাজে নারীশিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বেগম রোকেয়া বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

বীরেশলিঙ্গম পান্তুলু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বিধবাবিবাহ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

জ্যোতিরাও ফুলে 'সত্যশোধক সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মহারাষ্ট্রে নীচুতলার মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালান।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 'আর্য সমাজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। বিধবাবিবাহ ও নারীশিক্ষাকে তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলন এর প্রাণপুরুষ ছিলেন রামমোহন রায়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ ছিল সামাজিক সংস্কারসাধন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয়সভা থেকে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন এই আন্দোলনকে সংগঠিত করেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এর উদ্যোগে ব্রাহ্ম আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল। কলকাতার শিক্ষিত সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় বিস্তার লাভ করেছিল।

রামকৃষ্ণ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। উনিশ শতকে শহুরে শিক্ষিত মানুষের কাছে রামকৃষ্ণের এক বিশেষ আবেদন তৈরি হয়েছিল।

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। ভারতীয় দর্শন ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তিনি সচেষ্ট হন। বিবেকানন্দ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সৈয়দ আহমদ খান মুসলিম সমাজের জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটান।

মনে রাখা জরুরি :

- সমাজ ও ধর্মসংস্কারে উদ্যোগ নিতে ভারতীয় সমাজের একাংশ এগিয়ে এসেছিল।
- ঔপনিবেশিক শাসকদের একাংশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।
- বাংলার পাশাপাশি ভারতের অন্যত্র সংস্কার-আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) সতীদাহ প্রথা কে আইন করে রদ করেন?

(খ) ‘নব্যবঙ্গ’ কাদের বলা হতো?

(গ) আর্য সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(ঘ) আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(ঙ) ‘সত্যশোধক সমাজ’ কোন উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছিল?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) নারীশিক্ষার প্রসারে পণ্ডিতা রমাবাঈ-এর ভূমিকা কী ছিল?

(খ) বিদ্যাসাগর কেন স্মরণীয়?

(গ) হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভূমিকা উল্লেখ করো।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া

১০

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী নানা প্রতিবাদ-আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পটভূমি, প্রকৃতি ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ভারতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিরোধ-বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। নীচে একটি তালিকার মাধ্যমে বিদ্রোহগুলিকে দেখানো হলো :

বিদ্রোহের নাম	কারণ	অঞ্চল	চরিত্র	নেতৃত্ব
১. সাঁওতাল হুল	• ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের প্রতিক্রিয়া • সাঁওতাল এলাকায় জমিদার ও বহিরাগত মহাজনদের ক্ষোভ	ভাগলপুর থেকে রাজমহল এলাকায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল	জমিদার, মহাজন বিরোধী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছায়	সিধু, কানহু
২. মুণ্ডা উলগুলান	• বহিরাগত দিকুদের দ্বারা জমি অধিগ্রহণ • জমিদার, মহাজন, খ্রিস্টান মিশনারি ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি ক্ষোভ	ছোটোনাগপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলে	জমিদার, মহাজন, খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরোধিতা ও ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল	বীরসা মুণ্ডা
৩. ফরাজি আন্দোলন	• জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার • ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা	পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর অঞ্চলে শুরু হয়ে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে	জমিদার, নীলকর, মহাজন বিরোধী এই কৃষক আন্দোলনে ধর্মীয় চরিত্র লক্ষ করা গিয়েছিল	হাজি শরিয়তউল্লা, দুদু মিঞা

৪. ওয়াহাবি আন্দোলন	• জমিদার, নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। • ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা।	নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণার পাশাপশি পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল	এই কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় চরিত্র লক্ষ করা গিয়েছিল	সৈয়দ আহমেদ, তিতুমির
৫. নীলবিদ্রোহ	• নীলচাষে কৃষকদের বাধ্য করা। • নায্য দাম না দেওয়া। • নীলচাষে ক্ষতির সম্ভাবনা। • নীলকর সাহেবদের অত্যাচার।	নদিয়া, যশোহর, মালদহসহ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে	নীলকর ও ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ	বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস দিগম্বর বিশ্বাস

১৮৫৭-র বিদ্রোহ : ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত নানান নীতি ভারতীয়দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সেনারা নানাভাবে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হতো। স্বাভাবিকভাবে তারা কোম্পানি-কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এনফিল্ড রাইফেলের টোটা ব্যবহার নিয়ে ভারতীয় সেনারা বিরোধিতা শুরু করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্যারাকপুরের সেনাছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে ইউরোপীয় এক সেনা-আধিকারিককে গুলি করে। শুরু হয়ে যায় বিদ্রোহ। এরপর বিদ্রোহ দিল্লি, অযোধ্যা, কানপুর, মিরাট, ঝাঁসি প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপি প্রমুখ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করে।

ব্রিটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সেনারা প্রথম এই বিদ্রোহ শুরু করে। সেজন্য অনেকে ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। এই বিদ্রোহে দেশীয় রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই বিদ্রোহ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার জন্য ‘জাতীয় বিদ্রোহ’-এর রূপ লাভ করেছিল। ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদীরা ‘ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলে ব্যাখ্যা করেন।

১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। রানি ভিক্টোরিয়াকে ব্রিটিশ-ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হয়। গভর্নর জেনারেল পদের পরিবর্তে ভাইসরয় পদের সৃষ্টি হয়। লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

মনে রাখা জরুরি :

- ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন উপজাতি ও কৃষক-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।
- সাঁওতাল হুল ও মুণ্ডা উলগুলান চরিত্রগত দিক দিয়ে ছিল উপজাতি বিদ্রোহ।
- ওয়াহাবি, ফরাজি ও নীলবিদ্রোহ ছিল জমিদার ও ঔপনিবেশিক প্রশাসন-বিরোধী প্রতিরোধ।
- ১৮৫৭-র বিদ্রোহ শুরু করেছিল ব্রিটিশ বাহিনীর অধীন ভারতীয় সেনারা।
- ১৮৫৭-র বিদ্রোহ জাতীয় চরিত্র লাভ করেছিল।
- ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবলুপ্তি ঘটেছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী গণআন্দোলন
(ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ)
উত্তর
মিরাট
দিল্লি
বেরেলি
লখনৌ
ফৈজাবাদ
কানপুর
গোয়ালিয়র
ঝাঁসি
আরা
জবলপুর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভেলোর
কিথিপুরা
ত্রিবাঙ্কুর
তিরুনেলভেলি
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র
মে ১৮৫৭-র পূর্বে সিপাহি অভ্যুত্থান
১৮৫৭-র পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ
১৮৫৭-র পূর্বে ধর্ম-কেন্দ্রিক কৃষক বিদ্রোহ
১৮৫৭-র পূর্বে অন্যান্য বিদ্রোহ

নমুনা প্রশ্ন

১. **সঠিক তথ্য দিয়ে নীচের ছকটি পূরণ করো :**

বিদ্রোহ/আন্দোলন	নেতৃত্ব (একজন)	চরিত্র
মুণ্ডা বিদ্রোহ		
নীলবিদ্রোহ		
ওয়াহাবি আন্দোলন		

২. **১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল তার তালিকা তৈরী করো।**

নমুনা প্রশ্নপত্র - ২

১. **অতিসংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে):**

(ক) দেওয়ানি লাভের মধ্যে দিয়ে কোম্পানী কী কী অধিকার আদায় করেছিল?

(খ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতকে কয়টি প্রদেশে ভাগ করেছিল?

(গ) ইম্পিরিয়াল কোর্ট কবে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

(ঘ) সতীদাহ প্রথা কবে, কার উদ্যোগে রদ করা হয়?

(ঙ) নীলবিদ্রোহের দুজন নেতার নাম লেখো।

২. **শূণ্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে পাশ হয় _____।

(খ) বাংলা বিহার ও উড়িষ্যাতে _____ ভূমি বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল।

(গ) দেশীয় শিল্পের অধঃপতন _____ নামে পরিচিত।

(ঘ) এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন _____।

(ঙ) ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করেন _____।

(চ) মেকলে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করেন _____খ্রিস্টাব্দে।

(ছ) 'সত্যশোধক সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন _____।

(জ) প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন _____।

৩. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
ইন্ডিয়ান পেনাল কোড	ওয়ারেন হেস্টিংস
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক
পুলিশি ব্যবস্থা	লর্ড কর্নওয়ালিস
বেনারস সংস্কৃত কলেজ	আলেকজান্ডার ডাফ
কলকাতা মাদ্রাসা	জোনাথন ডানকান
হিন্দু কলেজ	ডেভিড হেয়ার

৪. **সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :**

(ক) পিটের ভারত শাসন আইন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(খ) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কেন বিখ্যাত?

(গ) ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে 'জাতীয় বিদ্রোহ' বলা কী যুক্তিযুক্ত?

(ঘ) ব্রিটিশ বাহিনীর অধীন ভারতীয় সেনারা কেন বিদ্রোহ করেছিল?

৫. **নিজের ভাষায় লেখো (সাত-আটটি বাক্যে) :**

ভারত কীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রত্নে পরিণত হয়েছিল?

৬. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ কোন কোন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল — তার একটি তালিকা তৈরি করো।

জাতীয়তাবাদ ও তার বিকাশ

১১

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- ভারতে কীভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

জাতীয়তাবাদ ও তার বিকাশ :

সাধারণ অর্থে জাতি বলতে বোঝায় একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, যে ভূখণ্ডকে তাঁরা নিজেদের বাসভূমি বলে মনে করেন। এই জনগোষ্ঠীর একটি সাধারণ ঐতিহ্য, বিকাশ এবং সম্ভব হলে একটি সাধারণ ভাষা থাকবে। জাতি (Nation) শব্দটি গোষ্ঠী (clan), সম্প্রদায় (tribe), বর্ণ (race) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে জাতি কথাটি একটি রাজনৈতিক পরিচয় পেতে শুরু করেছিল।

আধুনিক অর্থে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের অর্থ হলো একটি বিশেষ জাতির ঐক্যবদ্ধ হবার ও অন্য জাতির আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল মূলত উনিশ শতকেরই সৃষ্টি। জাতীয়তাবাদ হল একটি মানবিক অবস্থা, যা চেতনাকে আলোড়িত করে। এরিখ হবসবম, বেনেডিক্ট আন্ডারসন প্রমুখ সকলেই একমত যে, জাতীয় চেতনার উদ্ভবের পশ্চাতে দুটো ঘটনা জড়িয়ে আছে—পশ্চিমি ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং আঠারো শতকে ঘটে যাওয়া দুটি যুগান্তকারী বিপ্লব। যথা - ফরাসি বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব। তবে এদুটো বিপ্লবের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রসারে দ্বিতীয়টির প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী। ফরাসি বিপ্লব ছিল অনেক নতুন চিন্তাধারার উৎস। বিপ্লবপ্রসূত চিন্তাধারা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

উনিশ শতকে ভারতেও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার পশ্চাতে বেশ কিছু সভাসমিতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও প্রতিবাদের মঞ্চ হিসাবে অধিকাংশ সভাসমিতিগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্য থাকলেও ধীরে ধীরে এই সংগঠনগুলি আঞ্চলিক স্তরে জাতীয়তাবাদের প্রসারে ভূমিকা নিয়েছিল।

উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য কিছু রাজনৈতিক সংগঠন

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠাকাল	প্রতিষ্ঠাতা
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা	১৮৩৬	প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকাকুমার ঠাকুর
জমিদার সভা	১৮৩৮	দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব
হিন্দু মেলা	১৮৬৭	নবগোপাল মিত্র
ভারতসভা	১৮৭৬	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপের এই নব-ভাবধারা ভারতে বয়ে এনেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা। চিন্তার জগতে আধুনিকতার প্রবেশ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বেনেডিক্ট আন্ডারসন মনে করেন, এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব পাশ্চাত্যের কোনো না কোনো আদর্শকে অনুসরণ করেই হয়েছিল। এই মতবাদ এশিয়দের নিজস্ব ইতিহাস সৃষ্টিতে তাদের বৌদ্ধিক অবদানকে অস্বীকার করে। সি.এ.বেইলি অবশ্য বলেছেন, 'পরম্পরাগত স্বাদেশিকতা' থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ :

একটি বিষয়কে ঘিরে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তা হলো, ভারতের আর্থিক দুরবস্থায় ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা নিয়ে নরমপন্থী নেতৃত্ব প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রক্রিয়াকে *অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ* (Economic Nationalism) বলা হয়। এই কাজে বিশেষ করে দাদাভাই নৌরজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রমেশচন্দ্র দত্ত—এই তিনজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের দারিদ্য ও ব্রিটিশ-শাসনের সম্পর্ক নির্ণয় করা।

জাতীয়তাবাদের ধারনা প্রসঙ্গে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পৃথক অবস্থান ছিল। নরমপন্থীরা জাতীয়তাবাদের ধারনার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষকে আধুনিক করতে চেয়েছিলেন। চরমপন্থীরা অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনের সার্বিক বিরোধিতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করতে থাকেন। চরমপন্থীরা ভারতের 'গৌরবময়' অতীতকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেন। বাংলায় সরলাদেবী চৌধুরাণী প্রতাপাদিত্য উৎসব, মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন।

মনে রাখা জরুরি :

- জাতীয়তাবাদ হল এমন একটি শক্তি যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে।
- উনিশ শতকে আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার আত্মপ্রকাশ ঘটে।
- ভারতে জাতীয়তাবাদের প্রসারে সভাসমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
- অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের দারিদ্র ও ব্রিটিশ শাসনের সম্পর্ক নির্ণয় করা।

তোমরা জাতীয়তাবাদের প্রসার বিষয়ে নবম শ্রেণির দ্বিতীয় অধ্যায়ে নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ আলোচনায় আরো বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি-দুটি বাক্যে) :

(ক) জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝ?

(খ) নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ধারনার পার্থক্য কিরূপ ছিল?

(গ) 'অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ' কী?

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিন-চারটি বাক্যে) :

(ক) প্রতাপাদিত্য উৎসব, শিবাজী উৎসব প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিয়েছিল?

(খ) জাতীয়তাবাদের প্রসারে সভাসমিতিগুলি কেমন ভূমিকা পালন করেছিল?

সংবিধান

১২

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- স্বাধীন ভারতের সংবিধান নির্মাণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
- স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- নাগরিক অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

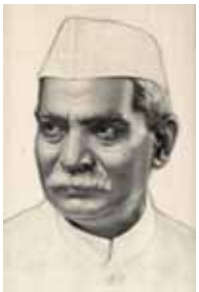

গণপরিষদের সভাপতি
ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ

স্বাধীন ভারতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হলো একটি সংবিধানের। অবশ্য স্বাধীনতালাভের আগেই সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার ক্রমাগত আন্দোলনের চাপে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সংবিধানসভা গঠনের উদ্যোগ নেয়। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদ গঠিত হয়, সভাপতি নির্বাচিত হন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন বি. আর. আম্বেদকর।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূল রূপকার বি. আর. আম্বেদকর।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধানটি গৃহীত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতে কার্যকর হলো সংবিধান। ভারত সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হলো। ভারতের সংবিধান বিশ্বের সবথেকে বড়ো সংবিধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের থেকে মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, আয়ারল্যান্ডের থেকে নির্দেশমূলক নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা :

সংবিধানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে প্রস্তাবনায়। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র' বলা হয়েছে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনীতে 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই দুটি আদর্শ যুক্ত হয়েছে। প্রস্তাবনাকে 'সংবিধানের বিবেক' বা 'সংবিধানের আত্মা' বলা হয়।

ভারতের সংবিধান

প্রায় তিন বছর আলোচনা-বির্তকের পরে ভারতের সংবিধান তৈরি হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হয়। ২৬ জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র দিবস' পালন করা হয়।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা। মূল পৃষ্ঠাটির অলংকরণ করেছিলেন নন্দলাল বসু।

ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ

ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের ছয়টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেই মৌলিক অধিকারগুলি হলো :

- সাম্যের অধিকার
- স্বাধীনতার অধিকার
- শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
- ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
- শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার
- সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক কর্তব্যসমূহ

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের দশটি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই মৌলিক কর্তব্যগুলি হলো :

- সংবিধান, সংবিধানের আদর্শ, বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় স্তোত্রের প্রতি সম্মান দেখানো।
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ আদর্শগুলির সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা ও রক্ষা করা।
- ভারতের প্রতিরক্ষায় অংশ নেওয়া এবং জাতীয় সেবামূলক কাজের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাতে যোগ দেওয়া।
- ধর্মীয়, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত বিভিন্নতার ঊর্ধ্বে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা এবং নারীর প্রতি মর্যাদাহানিকর আচরণ ত্যাগ করা।
- ভারতের সমন্বয়বাদী, মিশ্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে সম্মান ও রক্ষা করা।
- ভারতের বন্যপ্রাণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ তৈরি করা।
- প্রত্যেক নাগরিকের তরফে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের মানসিকতাকে গ্রহণ করা ও তার দ্বারা চালিত হওয়া।
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা ত্যাগ করা।
- ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সার্বিক জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে চলা।
- বাবা-মা অথবা অভিভাবক-অভিভাবিকার কর্তব্য হলো তাঁদের ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়স্ক সন্তান বা পোষ্যের শিক্ষার যথোচিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা (এটি ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনে যুক্ত হয়েছে)।

মনে রাখা জরুরি :

- শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হলো সংবিধান।
- ভারতীয় সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন খসড়া কমিটি।
- ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।
- ভারতীয় সংবিধানে ছয়টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।
- ভারতীয় সংবিধানে দশটি মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত আছে।

তোমরা নবম শ্রেণির দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের প্রেক্ষিতে কোড নেপোলিয়ন প্রণয়ন বিষয়ে পড়ার সময় নেপোলিয়নের আইন সংহিতার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানবে। এই আইন সংহিতা ফ্রান্সের সীমা অতিক্রম করে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও প্রসারিত হয়েছিল। এই আইন সংকলনের মাধ্যমে সংবিধানের ধারণা তোমরা পেতে পারো।

নমুনা প্রশ্ন

১. **নীচে দেওয়া তালিকাটিতে যে বিকল্পগুলি ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে সেগুলির পাশে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও :**

সাম্যের অধিকার ☐ জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ☐

জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা ☐ ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ☐

স্বাধীনতার অধিকার ☐ ঐক্য ও সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা ☐

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ☐

২. **নীচে দেওয়া তথ্যগুলি ছকের নির্দিষ্ট ঘরে লেখো :**

মৌলিক অধিকার	মৌলিক কর্তব্য

তথ্য : ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে চলা, সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার, নারীর মর্যাদাহানিকর আচরণ ত্যাগ করা, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার।

গণতন্ত্রের প্রসার

১৩

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলির তালিকা বানাতে পারবে।
- পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো চিহ্নিত করতে পারবে।

স্বাধীন ভারতের সরকারের সামনে বেশ কয়েকটি বড়ো সমস্যা ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা দেশকে জটিল পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়েছিল। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। অসংখ্য মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছিল। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বাধীন সরকার এসব সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং দেশ গঠনের কাজে মনোনিবেশ করে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। গণতন্ত্র বলতে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বোঝায়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে গণতন্ত্র বলতে মূলত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বোঝানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভোট দিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির আইনসভায় এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয় । রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীপরিষদ নিয়ে কেন্দ্রের শাসনবিভাগ গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি হলেন সাংবিধানিক প্রধান। কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নের্তৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদই রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন ব্যবস্থা গ্রামীণ ও পৌর — এই দুটি ভাগে বিভক্ত। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নামে পরিচিত। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় তিনটি স্তর লক্ষ করা যায়। এগুলি হলো— গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ পৌরসভা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদের প্রসারের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিস্তারও শুরু হয়েছিল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক রাজতন্ত্রকে বাতিল ঘোষণা করে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ায়। তুরস্কের কাছে পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রিসে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ও প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ডের মতো দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে ইতালির ফ্যাসিবাদী ও জার্মানির নাৎসিবাদী আদর্শের সংঘাত বাধে। এই সংঘাত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

তোমরা নবম শ্রেণির পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের প্রসার সম্পর্কিত আলোচনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের প্রসার সম্পর্কে জানবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ বনাম গণতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে।

মনে রাখা জরুরি :

- সংবিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়।
- প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
- ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো গড়ে উঠেছে।
- যুক্তরাষ্টীয় কাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হয়।
- ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় সাংবিধানিক প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি।

নমুনা প্রশ্ন

১. নীচের শব্দছকে ফাঁকা জায়গাগুলিতে উপযুক্ত অক্ষর বসিয়ে একটি করে অর্থবহ শব্দ তৈরি করো :

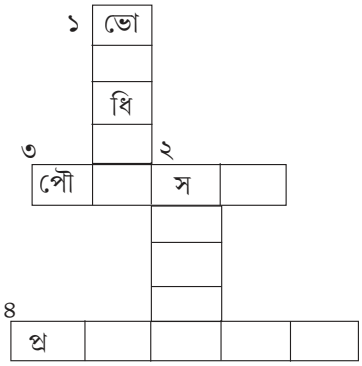

সূত্র :

উপর-নীচ : ১. গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ২. আইনসমূহের সংকলন

পাশাপাশি : ৩. স্থানীয় শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৪. কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বে থাকেন

নমুনা প্রশ্নপত্র - ৩

১. **অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (একটি - দুটি বাক্যে) :**

(ক) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা কাদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল?

(খ) ভারতসভা কার উদ্যোগে, কোন সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

(গ) ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে কোন দুটি আদর্শ যুক্ত হয়েছে?

(ঘ) ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কী?

২. **শূণ্যস্থান পূরণ করো :**

(ক) হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন _____।

(খ) ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয় _____।

(গ) ভারতীয় সংবিধানে ছয়টি _____ কথা বলা হয়েছে।

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে _____ মৌলিক কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত আছে

(ঙ) ভারতীয় সংবিধানের মূল রূপকার _____।

(চ) রাজেন্দ্র প্রসাদ _____ সভাপতি নির্বাচিত হন।

(ছ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক প্রধান হলেন _____।

(জ) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন হয় _____ কাঠামোতে।

৩. **স্তম্ভ মেলাও :**

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
জমিদার সভা	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত সভা	রাধাকান্ত দেব
হিন্দু মেলা	প্রসন্নকুমার ঠাকুর
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা	নবগোপাল মিত্র

৪. **নিচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :**

(ক) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর স্বাধীন ভারতে সংবিধান কার্যকর হয়।

(খ) স্থানীয় শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ পৌরসভা।

(গ) সংবিধান অনুযায়ী ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।

(ঘ) ভারতে সার্বিক ভোটাধিকার স্বীকৃত নয়।

(ঙ) আয়ারল্যাণ্ডের থেকে নির্দেশমূলক নীতি ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে।

৫. **সংক্ষেপে উত্তর দাও (তিনটি-চারটি বাক্যে):**

(ক) সভাসমিতি কেন গড়ে উঠেছিল?

(খ) স্বাধীন হওয়ার পর ভারতকে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

(গ) ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় কী বলা হয়েছে?

(ঘ) জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝো?

(ঙ) ভারতের সংবিধানে বিশ্বের অন্য দেশের সংবিধানের কোন বিষয়গুলি সংযোজিত হয়েছে?

শিখন সেতু-র বিষয় প্রসঙ্গে

- নবম শ্রেণির ব্রিজ মেটিরিয়ালে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবিষয় মধ্যযুগ ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবিষয় আধুনিক ভারতের ইতিহাস স্থান পেয়েছে।
- নবম শ্রেণি ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলত দুটি ভাবনা স্থান পেয়েছে — সংযোগরক্ষাকারী বিষয় ও মৌলিক বিষয়।
- সপ্তম শ্রেণির সামন্ততন্ত্র, সাম্রাজ্যের ধারণা, জাতীয়তাবাদের বিকাশ — এই বিষয়গুলি সংযোগরক্ষাকারী বিষয় হিসেবে ব্রিজ মেটিরিয়ালে দেওয়া হয়েছে।
- অষ্টম শ্রেণির ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, সংবিধান সংক্রান্ত ধারণা বা গণতন্ত্রের প্রসার সংযোগরক্ষাকারী বিষয় হিসেবে ব্রিজ মেটিরিয়ালে জায়গা পেয়েছে।
- আবার সপ্তম শ্রেণির ভক্তিবাদ ও সুফিবাদ, মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট এবং অষ্টম শ্রেণির ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি, সমাজ ও ধর্ম সংস্কার, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া — এই বিষয়গুলি মৌলিক বিষয় হিসেবে ব্রিজ মেটিরিয়ালে দেওয়া হয়েছে।
- ব্রিজ মেটিরিয়ালে রাখা নমুনা প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণের জন্য রাখা হয়েছে। এই নমুনা প্রশ্নের সাথে নবম শ্রেণির মূল্যায়ণপত্রের গঠনগত মিল নাও থাকতে পারে।

শিখন সেতু

ভূগোল

নবম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

বিশেষজ্ঞ কমিটি।

শিখন সেতু

ভূগোল

নবম শ্রেণি

সত্যমেব জয়তে

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
(চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
(সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ)

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদনা ও বিন্যাস

x!˜!¨“by ö”

বিষয় নির্মাণ

ö¢ï!¦b„b ¦bRy‰byë “b˜ëy ‰bÄyÝby<# !ßb?•ö”î ö¢˜†®

সহায়তা

ößb£y!Ÿ¢ b™ye

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
1. গ্রহরূপে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	1
2. ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়	10
নমুনা প্রশ্নপত্র ১	14
3. ভূমিরূপের সাধারণ পরিচিতি	15
4. শিলা ও মাটির পরিচয়	23
নমুনা প্রশ্নপত্র ২	27
5. পরিবেশের অবনমন ও মানুষের উপর তার প্রভাব	28
6. ভারতের অবস্থান ও প্রতিবেশী দেশসমূহ	34
7. মানচিত্র ও স্কেলের সাধারণ পরিচিতি	39

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিশেষত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

1 গ্রহরূপে পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পৃথিবীর আকৃতি ও কক্ষপথ বর্ণনা করতে পারবে।
- পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণ গতির বর্ণনা করতে পারবে।
- পৃথিবীর অনুসূর ও অপসূর অবস্থানের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারবে।
- অধিবর্ষ শনাক্ত করতে পারবে।
- উপযুক্ত রেখাচিত্রসহ ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সূর্যের আপাত গতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দৈনন্দিন জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পৃথিবীর আকৃতি ও কক্ষপথ

পৃথিবীর আকৃতি কীরকম-এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে পৃথিবীর আকৃতি গোল। তবে পুরোপুরি গোল নয়, কারণ এর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সামান্য একটু চাপা এবং মধ্যবর্তী অংশ স্ফীত। পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিমি। পৃথিবীর মেরুব্যাস ১২৭১৪ কিমি আর নিরক্ষীয় ব্যাস ১২৭৫৬ কিমি। পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস মেরুব্যাসের তুলনায় ৪২ কিমি (১২৭৫৬-১২৭১৪ কিমি) বেশি। অর্থাৎ পৃথিবী মাঝবরাবর ৪২ কিমি স্ফীত। পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি পৃথিবীরই মতো - যাকে ইংরাজিতে বলা হয় **'Geoid'**।

তোমরা জানো, পৃথিবীর একটি ছোটো মডেল হলো গ্লোব। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখবে একটি রড বা দণ্ড এই গ্লোবের ঠিক মাঝখান দিয়ে গিয়ে উপর-নীচ ফুঁড়ে বেরিয়েছে। পৃথিবীরও ঠিক মাঝখান অর্থাৎ কেন্দ্র দিয়ে একটি সরলরেখা কল্পনা করা হয়েছে, যা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দুকে যুক্ত করেছে। এটি হলো পৃথিবীর কল্পিত অক্ষ। এর উপর পৃথিবী প্রচণ্ড গতিতে নির্দিষ্ট পথে ঘুরে চলেছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, পৃথিবী যে পথে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তা হলো পৃথিবীর **কক্ষপথ (orbit)** এবং পৃথিবীর কেন্দ্র যে তলে রয়েছে তা হলো **কক্ষতল (orbital plane)**। পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখা কক্ষতলের সঙ্গে সবসময় ৬৬$\frac{১}{২}$° কোণে অবস্থান করে এবং পৃথিবীর নিরক্ষরেখা কক্ষতলের সঙ্গে ২৩$\frac{১}{২}$° কোণে অবস্থান করে। পৃথিবীর এই কক্ষপথটি হলো উপবৃত্ত আকৃতির।

গ্লোব

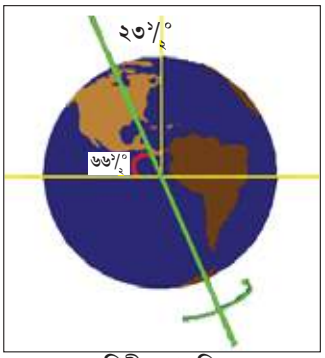

পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষ

পৃথিবীর আবর্তন গতি

পৃথিবী তার কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ কোণে হেলে নিজ অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে অবিরাম পাক খাচ্ছে। এটাই পৃথিবীর আবর্তন গতি। এতে সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা প্রায় ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ১ দিন। তাই এই গতির আর এক নাম দৈনিক গতি।

পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন

পরিক্রমণ গতি

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পৃথিবীর কক্ষপথ ও আবর্তন গতি সম্পর্কে তোমরা বিস্তারিত জেনেছ। এবার আমরা পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করব। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর শুধু আবর্তন করে না, তার সঙ্গে নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকৃতির কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সূর্যের চারিদিকেও ঘোরে। এটাই হলো পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি। এই পরিক্রমণে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা প্রায় ১ বছর। এই পরিক্রমণ গতির মাধ্যমে বছর গণনা করা হয় বলে এই গতির আর এক নাম **বার্ষিক গতি।** পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করতে করতে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এগোতে এগোতে সূর্যকে পরিক্রমণ করে চলেছে।

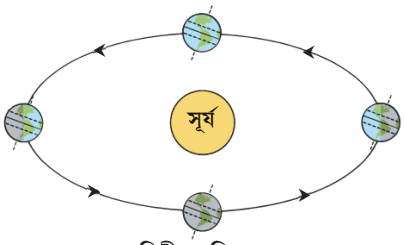

পৃথিবীর পরিক্রমণ

পৃথিবীর অনুসূর ও অপসূর অবস্থান

উপবৃত্তাকৃতি কক্ষপথের একটি ফোকাসে সূর্য অবস্থান করে, এ কারণে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় সমান থাকে না। এইভাবে পরিক্রমণের সময় জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে, প্রায় ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবীর কক্ষপথে সূর্য থেকে পৃথিবীর এই নিকটতম অবস্থান হলো অনুসূর অবস্থান। অপরদিকে জুলাই মাসের ৪ তারিখে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে, প্রায় ১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবীর কক্ষপথে সূর্য থেকে পৃথিবীর এই দূরতম অবস্থানের নাম অপসূর অবস্থান।

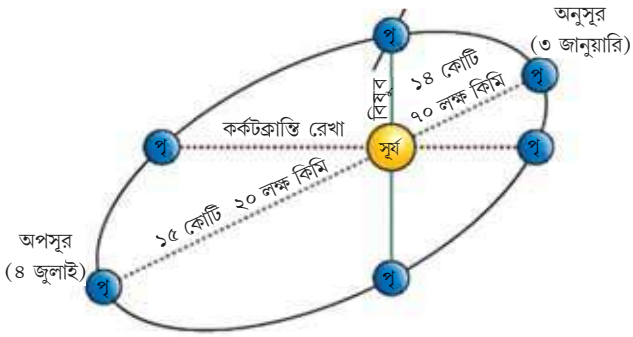

পৃথিবীর অনুসূর ও অপসূর অবস্থান

অধিবর্ষ

তোমরা আগেই জেনেছ যে সূর্যকে একবার সম্পূর্ণ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। কিন্তু গণানার সুবিধার জন্য ৩৬৫ দিনে এক বছর ধরা হয়। ফলে প্রতি বছর এই ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা প্রায় ৬ ঘণ্টা সময় বাড়তি থেকে যায়। এই বাড়তি সময়ের হিসেব ঠিক রাখার জন্য প্রতি ৪ বছর অন্তর ৬ ঘণ্টার ৪ গুণ (৪ × ৬ = ২৪) অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ধরে একদিন ফেব্রুয়ারি মাসের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়। ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনে হয় এবং বছরটি হয় ৩৬৬ দিনের। এই বিশেষ বছরটিকে **অধিবর্ষ (Leap Year)** বলে।

কীভাবে চিনবে এই অধিবর্ষ?

কোনো বছরের মোট দিন সংখ্যা ৪ দিয়ে বিভাজ্য হলে ওই বছর অধিবর্ষ ধরা হয়। যেমন-২০১২ এবং ২০১৬ সাল ছিল অধিবর্ষ। তবে দেখা গেছে, চার বছর অন্তর পুরো একটা অতিরিক্ত দিন ধরলে কিছু সময় বেশি ধরে নেওয়া হয়। কারণ ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের পরিবর্তে এইখানে আমরা ৬ ঘণ্টা ধরে নিচ্ছি। তাই এই সমস্যা মেটাতে শতাব্দী বছরগুলোর জন্য অধিবর্ষের নিয়ম একটু আলাদা করা হয়েছে। শতাব্দী বছরগুলোকে ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ না থাকে তবে সেগুলি অধিবর্ষ হবে। যেমন — ২০০০ সাল ছিল অধিবর্ষ।

সূর্যের আপাত গতি

সূর্যোদয়ের সময় ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখবে, সূর্য কিন্তু সারাবছর একই জায়গা থেকে উদিত হয় না বা অস্ত যায় না। শীতকালে আকাশে সূর্য একটু দক্ষিণে চলে যায় আবার গ্রীষ্মকালে আকাশে উত্তরে সরে আসে বলে মনে হয়। পৃথিবীর হেলানো অক্ষের জন্য বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি রেখা, মকরক্রান্তি রেখায় সূর্যের আলো লম্বভাবে পড়ে। ফলে আপাতভাবে মনে হয় যে সূর্য পৃথিবী থেকে উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণে মকরক্রান্তি রেখা পর্যন্ত চলাচল করে। আকাশের যে পথ দিয়ে সূর্যের এই আপাত গতি লক্ষ করা যায় তার নাম **রবিমার্গ** বা **সূর্যের আপাত বার্ষিক গতি**।

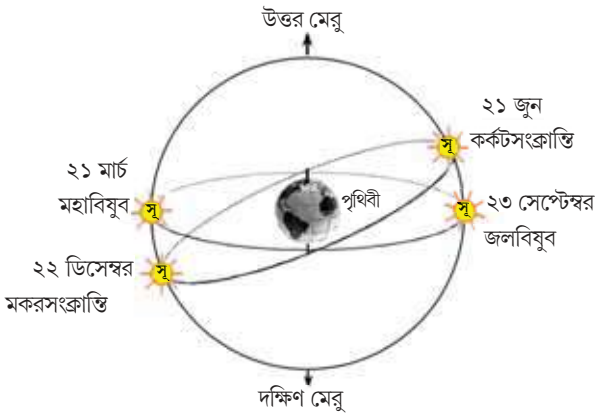

রবিমার্গ

এছাড়াও আমরা প্রতিদিন লক্ষ করি যে সূর্য পূর্ব আকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়। প্রকৃতপক্ষে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খায়। তাই সূর্যকে উল্টোদিকে সরে যেতে দেখা যায়। একেই বলে **সূর্যের আপাত দৈনিক গতি** ।

পৃথিবীর পরিক্রমণের ফল — ঋতু পরিবর্তন

২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন পর্যন্ত ছয় মাস ধরে সূর্যের আপাত উত্তরমুখী গতি হলো **উত্তরায়ণ**। অপরদিকে ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের আপাত দক্ষিণমুখী গতি হলো **দক্ষিণায়ন**। এর মাঝে ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর এই দুটি দিন বিষুবরেখার উপর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে। উত্তরায়ণের শেষ সীমা কর্কটক্রান্তি রেখার উপর ২১ জুন তারিখে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং ২২

ডিসেম্বর দক্ষিণায়নের শেষ সীমা অর্থাৎ মকরক্রান্তি রেখার উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। এইভাবে সূর্যের আপাত গতি যে অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই অঞ্চলে সূর্যরশ্মির পতন কোণের তারতম্যের উপর নির্ভর করে দিন রাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং এর পরিণাম হিসেবে ঋতু পরিবর্তন হয়।

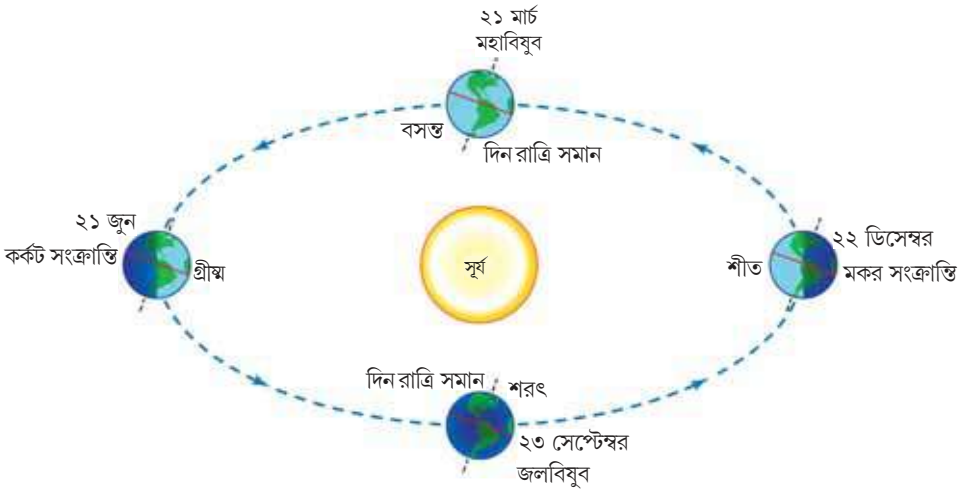

ঋতু পরিবর্তন

পৃথিবী তার উপবৃত্তাকৃতি কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ২১ মার্চ তারিখে এমন একটি অবস্থানে আসে যে সূর্যরশ্মি তখন বিষুবরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে। এইদিন পৃথিবীর সর্বত্রই দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য সমান হয় অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত হয়। এই ঘটনাকে বিষুব বলে। বিষুব কথার অর্থ হলো সমান দিনরাত্রি। এইরকম অবস্থার জন্য উত্তর গোলার্ধে আবহাওয়া মনোরম থাকে, না খুব গরম, না খুব ঠান্ডা। উত্তর গোলার্ধে এই সময় বসন্তকাল বিরাজ করে। তাই ২১ মার্চ দিনটি **বসন্তবিষুব** বা **মহাবিষুব** নামে পরিচিত।

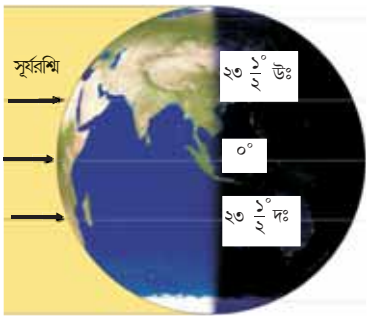

মহাবিষুব

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল

২১ মার্চের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটি অবস্থানে আসে যখন সূর্যরশ্মি উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ লম্বভাবে পড়তে থাকে। এর পরিণামস্বরূপ উত্তর গোলার্ধে দিন বড়ো ও রাত ছোটো হতে থাকে। দিন বড়ো ও রাত ছোটো হওয়ার কারণে সূর্যের উত্তরায়ণের সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের সূচনা হয় এবং ২১ জুন তারিখে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে কর্কটক্রান্তি রেখার উপর পড়ে। ওই দিন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়ো হয়। এই ২১ জুনকে বলে **কর্কটসংক্রান্তি বা উত্তর অয়নান্ত দিবস**। দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ দিন ছোটো ও রাত বড়ো হয়।

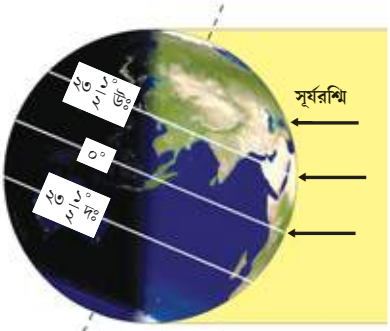

কর্কটসংক্রান্তি

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল

২১ জুনের পর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়, অর্থাৎ সূর্য আবার বিষুবরেখার দিকে সরতে থাকে। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পৃথিবী তার কক্ষপথে এমন একটি অবস্থানে আসে যে, বিষুবরেখার ওপর সূর্য আবার লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত সমান হয়। উত্তর গোলার্ধে এইসময় আবহাওয়া মনোরম থাকে, শরৎকালের সূচনা হয়। তাই ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে **শরৎবিষুব** বা **জলবিষুব** বলে।

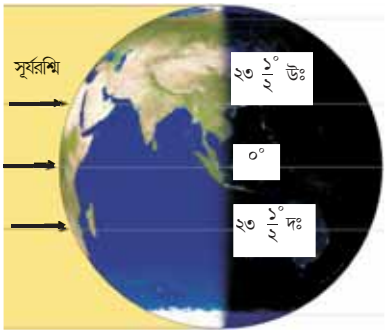

জলবিষুব

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল

২৩ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটা অবস্থানে আসে যে সূর্যরশ্মি দক্ষিণ গোলার্ধে ক্রমশ লম্বভাবে পড়তে থাকে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ক্রমশ বড়ো ও রাত ক্রমশ ছোটো হতে থাকে। তাই দক্ষিণায়নের সময় দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও উত্তর গোলার্ধে শীতকালের সূচনা হয়। ২২ ডিসেম্বর তারিখে সূর্যরশ্মি মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই ২২ ডিসেম্বরকে **মকরসংক্রান্তি** বা **দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস** বলা হয়। এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়ো ও রাত সব থেকে ছোটো হয়। অপরদিকে উত্তর গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

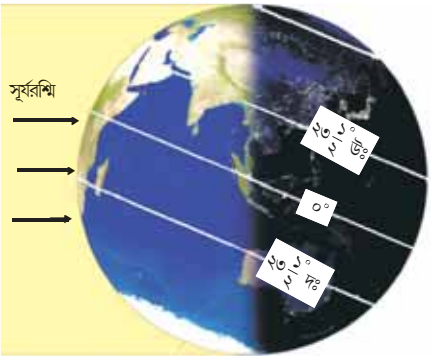

মকরসংক্রান্তি

নিশীথ সূর্যের দেশ

তোমরা জানো, পৃথিবী দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় আর রাত্রিবেলা হয় চাঁদের আলোয়। কিন্তু পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে অন্যরকম ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।

পৃথিবীর দুই মেরু বৃত্তে অর্থাৎ ৬৬$\frac{১}{২}$° উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় সারা বছর সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে সুমেরুবৃত্ত অঞ্চলে সূর্য কখনোই দিগন্তের নীচ থেকে ওঠে না আবার অস্তও যায় না। এইসময় সূর্যকে দিগন্তের প্রায় সমান্তরালে আকাশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করতে দেখা যায়। অপরদিকে সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ গোলার্ধের কুমেরুবৃত্ত অঞ্চলে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সময় এখানে ২৪ ঘণ্টা একটানা দিনের আলো থাকে। অর্থাৎ স্থানীয় সময় অনুসারে তখন রাত হওয়া সত্ত্বেও আকাশে সূর্যকে দেখা যায়।

নিশীথ সূর্য

২১ মার্চ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ছয় মাস সুমেরুতে যখন একটানা দিন চলে তখন নরওয়ের উত্তর সীমান্তের হেমারফেস্ট বন্দর থেকে গভীর রাতেও উত্তর মেরুর আকাশে সূর্যকে দেখা যায়। এর নাম নিশীথ সূর্য। এই জন্য নরওয়ের হেমারফেস্ট বন্দর এবং তার আশপাশের স্থানসমূহের নাম **'নিশীথ সূর্যের দেশ'**।

সুমেরু প্রভা ও কুমেরু প্রভা

সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত অঞ্চলে রাতের আকাশে মাঝে মাঝে এক অপূর্ব সুন্দর আলোর জ্যোতি দেখা যায়। একে মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা বলা হয়। উত্তর মেরুতে এই মেরুজ্যোতিকে বলে সুমেরু প্রভা এবং দক্ষিণ মেরুতে একে বলে কুমেরু প্রভা। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন আয়নিত গ্যাসের সঙ্গে সূর্যরশ্মির সংঘর্ষের ফলে মেরুবৃত্ত অঞ্চলের আকাশে এরকম বিচ্ছুরিত আলোর সৃষ্টি হয়।

সুমেরু প্রভা

দৈনন্দিন জীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব

ঋতুবৈচিত্র্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় বিষয়। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন সভ্যতায় আমরা ঋতুবৈচিত্র্যের নানান উল্লেখ পেয়েছি। বহু আগে থেকেই মানুষ ঋতু বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে কৃষিকাজ, সামাজিক এবং ধর্মীয় উৎসব পালন করে আসছে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ, শ্রমনৈপুণ্য, জীবিকার বিশেষীকরণ প্রভৃতি ঋতু বৈচিত্র্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সঠিক বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্যও ঋতু পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। বছরের বিভিন্ন সময় ঋতুবৈচিত্র্যের ফলে মানবজীবনে বৈচিত্র্য আসে, যা মানুষকে বিভিন্ন কাজে উৎসাহিত করে।

মনে রাখা জরুরি :

- আবর্তন গতি — যে গতিতে পৃথিবী তার কক্ষতলের সঙ্গে ৬৬$\frac{১}{২}^{\circ}$ কোণে হেলে নিজ অক্ষের চারিদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তিত হয়।
- পরিক্রমণ গতি — যে গতিতে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্বে সূর্যকে পরিক্রমণ করে ।
- অধিবর্ষ — যে বছর ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ দিনে এবং বছরটি ৩৬৬ দিনের হয়।
- উত্তরায়ণ — ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন পর্যন্ত সূর্যের আপাত উত্তরমুখী গতি।
- দক্ষিণায়ন — ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের আপাত দক্ষিণমুখী গতি।
- নিশীথ সূর্য — দুই মেরুবৃত্ত থেকে মেরুবিন্দু পর্যন্ত কোনো কোনো অঞ্চলে স্থানীয় সময়ের ভিত্তিতে রাতের আকাশে দৃশ্যমান সূর্য।

তোমরা এই বিষয়ে নবম শ্রেণির 'গ্রহরূপে পৃথিবী' এবং 'পৃথিবীর গতিসমূহ'- এই দুই অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় —

(ক) ২১ মার্চ (খ) ২২ ডিসেম্বর (গ) ২৩ সেপ্টেম্বর (ঘ) ২১ জুন।

১.২ পৃথিবী অপসূর অবস্থানে আসে —

(ক) ৪ জুলাই (খ) ৩ জানুয়ারি (গ) ২৩ সেপ্টেম্বর (ঘ) ২২ ডিসেম্বর।

১.৩ পৃথিবীর অক্ষ তার নিজের কক্ষতলের সঙ্গে যে কোণে অবস্থান করে তা হলো —

(ক) ০° (খ) ৯০° (গ) ৬৬$\frac{১}{২}$° (ঘ) ২৩$\frac{১}{২}$°।

১.৪ মকর সংক্রান্তি হয় —

(ক) ২২ ডিসেম্বর (খ) ২১ মার্চ (গ) ২৩ সেপ্টেম্বর (ঘ) ২১ জুন।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয় _____ অবস্থানে।

২.১.২ _____ সেপ্টেম্বরের বিষুবকে শরৎকালীন বিষুব বা জলবিষুব বলে।

২.১.৩ অনুসূর অবস্থানে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সবচেয়ে _____ হয়।

২.১.৪ ৩৬৬ দিনের বছরকে বলে _____।

২.২ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ পৃথিবী নিজ অক্ষের চারিদিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে ঘোরে।

২.২.২ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৯ দিন ছিল।

২.২.৩ নরওয়েকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলা হয়।

২.২.৪ ২১ জুন উত্তর অয়নান্ত দিবস।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ কোন গতির জন্য পৃথিবীতে দিনরাত্রি সংঘটিত হয়?

২.৩.২ ভূপৃষ্ঠের কোথায় বছরে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রি হয়?

২.৩.৩ বিষুব কথার অর্থ কী?

২.৩.৪ ২৫ ডিসেম্বর 'বড়োদিন'-এ দক্ষিণ গোলার্ধে গরম না ঠান্ডা?

২.৪ ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ মেলাও :

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
২.৪.১ ২১ মার্চ	১. অনুসূর
২.৪.২ ২৩ সেপ্টেম্বর	২. অপসূর
২.৪.৩ ৪ জুলাই	৩. মহাবিষুব
২.৪.৪ ৩ জানুয়ারি	৪. জলবিষুব
২.৪.৫ ২২ ডিসেম্বর	৫. মকর সংক্রান্তি

৩. নীচের চিত্রে অপসূর ও অনুসূর অবস্থান চিহ্নিত করো :

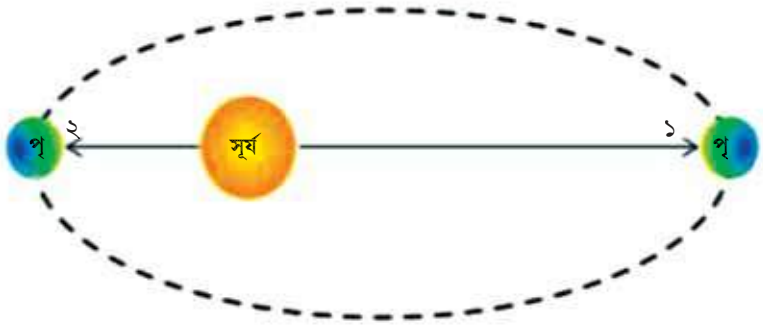

৪. নীচের শব্দছকটি পূরণ করো :

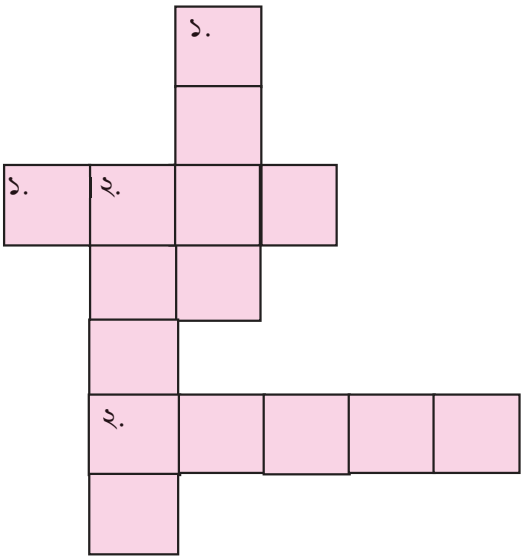

ওপর- নীচ

১. ৩ জানুয়ারি কক্ষপথে পৃথিবীর অবস্থান

২. পৃথিবীর সূর্যের চারিপাশে ঘোরা

পাশাপাশি

১. ৪ জুলাই কক্ষপথে পৃথিবীর অবস্থান

২. ২১ মার্চ দিনটির নাম

৫. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৫.১ সূর্যের আপাত দৈনিক গতি কাকে বলে?

৫.২ আবর্তন গতি কাকে বলে?

৬. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

৬.১ পৃথিবীর দৈনিক গতি ও বার্ষিক গতির মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

৬.২ মানবজীবনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব উল্লেখ করো।

৭. নীচের প্রশ্নটির উত্তর লেখো :

৭.১ উপযুক্ত চিত্রসহ পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ আলোচনা করো।

2 ভূপৃষ্ঠে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- কোনো স্থানের ঠিক অবস্থান নির্ণয়ে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভৌগোলিক জালকের সাহায্যে কোনো একটি স্থানের অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে।
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।
- গ্লোব বা ভূগোলকের উপর বিষুবরেখা ও মূলমধ্যরেখা চিহ্নিত করতে এবং অঙ্কন করতে পারবে।

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে তুমি কোথায় থাকো তোমরা কেউ হয়তো বলবে আমি কলকাতায় থাকি, আবার কেউ বলবে আমি শিলিগুড়িতে থাকি।

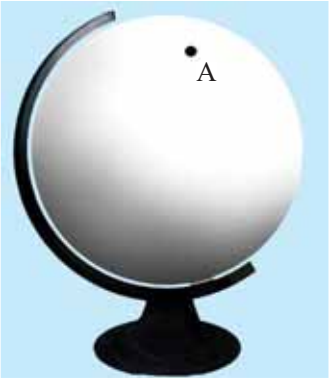

এই কলকাতা বা শিলিগুড়ি পৃথিবীর কোথায় অবস্থিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের **অবস্থান (Location)** সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। কোনো একটি স্থান বা শহর পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গায় অবস্থিত সেই বিষয়টি কীভাবে নির্ণয় করা হয়, তা আমরা জানার চেষ্টা করব।

পাশের ছবিতে একটি ফাঁকা গ্লোবের উপর 'A' বিন্দু দেখানো হয়েছে। এই ছবিটা দেখে তোমরা কি বলতে পারবে যে 'A' স্থানটি পৃথিবীর কোথায় অবস্থিত? হয়তো তোমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর দেবে যে, 'A' স্থানটি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত, কিন্তু 'A' স্থানটির সঠিক অবস্থান এই ছবি থেকে বলা সম্ভব নয়।

উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যেই ভৌগোলিকরা পৃথিবীর উপর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার কল্পনা করেন এবং অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলি একে অপরকে ছেদ করে যে জালিকাকার বিন্যাস তৈরি করে তার সাহায্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

ভৌগোলিক জালক (Geographical Grid)

পাশের ছবিটি লক্ষ করে দেখো একটি গোলকের উপর কয়েকটি রেখা টানা হয়েছে। গ্লোব বা ভূগোলকের ওপর এরকমই কয়েকটি রেখা আঁকা হয়।

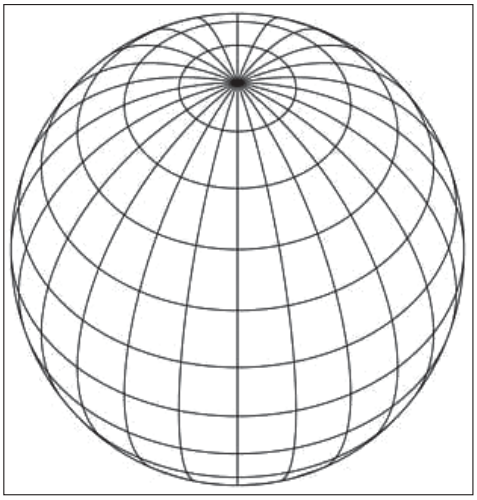

ভৌগোলিক জালক

গ্লোবের উপর অঙ্কিত পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত এই রেখাগুলি হলো অক্ষরেখা এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রেখাগুলি হলো দ্রাঘিমারেখা। এই অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলি একে অপরকে ছেদ করে গ্লোবের উপর একটি জালিকাকার বিন্যাস তৈরি করেছে। এই জালিকাকার বিন্যাসই হলো **ভৌগোলিক জালক (Geographical Grid)**।

ভৌগোলিক জালকের সাহায্যে কীভাবে পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা হয়, সেই বিষয়টি নীচের রেখা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

ভৌগোলিক জালকের সাহায্যে অবস্থান নির্ণয়

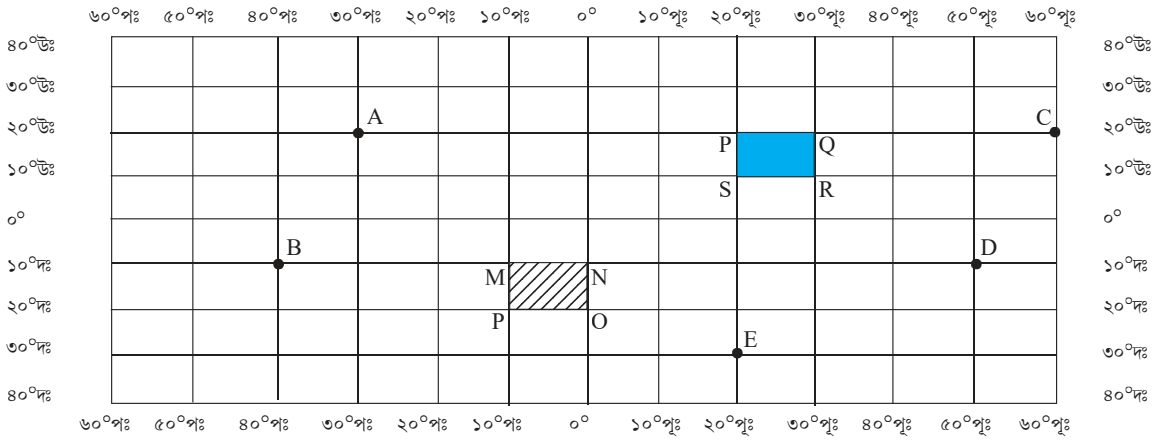

উপরের রেখাচিত্রটি লক্ষ করে দেখো, চিত্রে ‘A’ একটি স্থান, এই স্থানটির অবস্থান হলো ২০° উত্তর ও ৩০° পশ্চিম, কারণ ‘A’ স্থানটি ২০° উত্তর অক্ষরেখা ও ৩০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখার ছেদবিন্দুতে অবস্থিত। অর্থাৎ ভৌগোলিক জালকের সাহায্যে পৃথিবীর কোনো বিন্দুর বা স্থানের অবস্থান নির্ণয় করতে হলে ওই স্থানটি যে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার উপর অবস্থিত তাদের ছেদবিন্দুর সাপেক্ষে নির্ণয় করা হয়।

আবার কোনো একটি বড়ো অঞ্চল যার ক্ষেত্রমান বেশী, যেমন — একটি দেশের অবস্থান তার অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মানের সাহায্যে বোঝানো সম্ভব। উপরের চিত্রে PQRS (■) চিহ্নিত স্থানটির অবস্থান হলো — ১০° উত্তর থেকে ২০° উত্তর এবং ২০° পূর্ব থেকে ৩০° পূর্ব।

উপরের অঙ্কিত ভৌগোলিক জালক থেকে তোমরা B, C, D, E এই বিন্দুগুলির এবং ▨ MNOP অঞ্চলটির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করো।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নিরক্ষরেখা --- পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত পূর্ণবৃত্তাকার কাল্পনিক রেখাটি হলো নিরক্ষরেখা। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি গোলার্ধে বিভক্ত করেছে।

মূল মধ্যরেখা — পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বিন্দু সংযোগকারী পৃথিবীর মাঝবরাবর উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত কাল্পনিক অর্ধবৃত্তাকার রেখা হলো মূল মধ্যরেখা। এই রেখা পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে বিভক্ত করেছে।

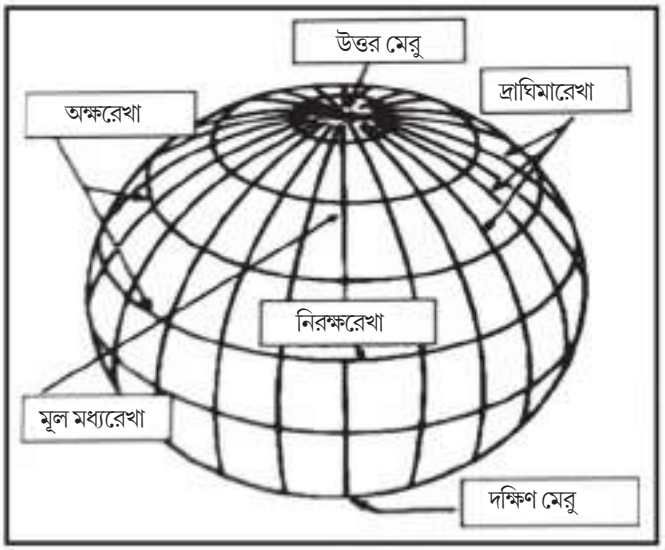

নিরক্ষরেখা থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে নির্দিষ্ট দূরত্বে পশ্চিম থেকে পূর্বে পূর্ণবৃত্তাকার অক্ষরেখা টানা হয়েছে। অক্ষরেখাগুলি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে

নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে সমান কৌণিক দূরত্বের স্থানগুলিকে যুক্ত করেছে। যদি নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণে ১° অন্তর অক্ষরেখা টানা হয় তাহলে ভূগোলকে অঙ্কিত মোট অক্ষরেখার সংখ্যা হবে ১৭৯টি। দ্রাঘিমারেখাগুলি মূলমধ্যরেখা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে সমান কৌণিক দূরত্বের স্থানগুলিকে যুক্ত করেছে। মূলমধ্যরেখা থেকে ১° অন্তর পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত অর্ধবৃত্তাকার দ্রাঘিমারেখা টানা হলে ভূগোলকে অঙ্কিত দ্রাঘিমারেখার সংখ্যা হবে ৩৬০টি।

কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো একটি স্থানের অবস্থান আরও নিখুঁতভাবে জানার জন্য প্রতি ১° অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মাঝে আরও ৫৯ টি রেখা আঁকা হয়েছে, যেগুলির মান ১′ (মিনিট) এবং এই ১′ অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাকে আবার ১″ (সেকেন্ড) করে ৬০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, কলকাতার অবস্থান ২২° ৩৪′ ২২″ উত্তর এবং ৮৮° ২১′ ৫০″ পূর্ব।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমারেখা
পরিচয়	পৃথিবীপৃষ্ঠে একই অক্ষাংশবিশিষ্ট স্থানগুলিকে যুক্তকারী পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কাল্পনিক রেখা।	পৃথিবীপৃষ্ঠে একই দ্রাঘিমাবিশিষ্ট স্থানগুলিকে যুক্তকারী উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কাল্পনিক রেখা।
সংখ্যা	১° অন্তর মোট অক্ষরেখার সংখ্যা ১৭৯টি।	১° অন্তর মোট দ্রাঘিমারেখার সংখ্যা ৩৬০টি।
আকৃতি	পূর্ণবৃত্তাকার ও প্রতিটি অক্ষরেখা পরস্পর সমান্তরাল।	অর্ধবৃত্তাকার ও পরস্পর সমান্তরাল নয়।
পরিধি	অক্ষরেখাগুলির পরিধি নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমশ কমতে থাকে।	দ্রাঘিমারেখাগুলির পরিধি সমান।

আমাদের পৃথিবীর বিশাল আকৃতির জন্য অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্য ছাড়া পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে সমতল ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের অবস্থান দুটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা সম্ভব। সেগুলি হলো—

- আপেক্ষিক অবস্থান (Relative Location)
- প্রকৃত অবস্থান (Absolute Location)

মনে রাখা জরুরি :

- ভৌগোলিক জালক — ভূগোলকের উপর অঙ্কিত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা একে অপরকে ছেদ করে যে জালিকাকার বিন্যাস তৈরি করে।
- নিরক্ষরেখা — উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু থেকে সমদূরত্বে অবস্থিত পৃথিবীর মাঝ বরাবর অঙ্কিত কাল্পনিক পূর্ণ বৃত্তাকার রেখা যা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি সমান গোলার্ধে বিভক্ত করেছে।
- মূলমধ্যরেখা — উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু সংযোগকারী যে অর্ধবৃত্তাকার কাল্পনিক রেখা পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি সমান গোলার্ধে বিভক্ত করেছে।

তোমরা এই বিষয়ে নবম শ্রেণির পাঠ্যসূচির দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ ভূগোলকে ১° অন্তর যে সংখ্যক অক্ষরেখা আঁকা যায় তা হলো —

ক) ৩৬০টি খ) ১৮০টি গ) ৯০টি ঘ) ১৭৯টি

১.২ দ্রাঘিমারেখাগুলির আকৃতি —

ক) বৃত্তাকার খ) অর্ধবৃত্তাকার গ) আয়তাকার ঘ) সরলরৈখিক

১.৩ কলকাতার অক্ষাংশ হলো —

ক) ২২° ৩৪′ ২২″ উত্তর খ) ২৩° ৩০′ ৩০″ উত্তর গ) ২২° ৩৪′ ২২″ দক্ষিণ ঘ) ২৩° ৩০′ ৩০″ দক্ষিণ

২. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ মূলমধ্যরেখা নিরক্ষরেখাকে _____ কোণে ছেদ করে।

২.২ মূলমধ্যরেখার ডানদিকের অংশটি _____গোলার্ধ।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৩.১ ভৌগোলিক জালক কাকে বলে?

৩.২ নিরক্ষরেখার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করো।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

৪.১ ভৌগোলিক জালকের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোনো একটি স্থানের অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করা যায় তা উপযুক্ত চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

৪.২ অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ১

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো :

১.১ নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যে বছরটি অধিবর্ষ তা হলো —

ক) ১৯০০ খ) ২০০০ গ) ২১০০ ঘ) ২৩০০

১.২ ভূপৃষ্ঠের মাঝবরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কাল্পনিক রেখাটি হলো —

ক) কর্কটক্রান্তি রেখা খ) মূল মধ্যরেখা গ) নিরক্ষরেখা ঘ) মকরক্রান্তি রেখা

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ পৃথিবীর অনুসূর অবস্থানে উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য _____ হয়।

২.১.২ আমরা প্রতিদিন লক্ষ করি সূর্য পূর্ব আকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিম আকাশে অস্ত যায়, একে বলা হয় সূর্যের _____ গতি।

২.১.৩ মূল মধ্যরেখার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত দ্রাঘিমারেখার মান হলো _____।

২.২ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ পৃথিবীর কক্ষপথের আকৃতি বৃত্তাকার।

২.২.২ উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল।

২.২.৩ দ্রাঘিমারেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল নয়।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ পৃথিবীর কক্ষপথ ও কেন্দ্র যে তলে অবস্থান করে, তাকে কী বলা হয়?

২.৩.২ ২১ জুন থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের আপাত দক্ষিণমুখী গতিকে কী বলা হয়?

২.৩.৩ কোন রেখার সাপেক্ষে কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা হয়?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৩.১ 'Geoid' বলতে কী বোঝ?

৩.২ মেরুপ্রভা কীভাবে সৃষ্টি হয়?

৩.৩ অক্ষরেখার প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর লেখো :

৪.১ কোনো একটি বছর অধিবর্ষ কিনা তুমি কীভাবে শনাক্ত করবে তা একটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখো।

3 ভূমিরূপের সাধারণ পরিচিতি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বিভিন্ন ভূমিরূপ চিহ্নিত করতে পারবে।
- ভূমিরূপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
- বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে।

আক্ষরিক অর্থে ভূমির উপরিভাগের গঠনগত আকৃতিকে **ভূমিরূপ (Landform)** বলে। 'Landform' এই ইংরাজি শব্দটিকে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, এটি দুটি শব্দ 'Land' অর্থাৎ ভূমি এবং 'Form' অর্থাৎ আকৃতি নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ সহজ কথায় ভূমিরূপ বা 'Landform' হলো '**ভূপৃষ্ঠের গঠনগত আকৃতি**'।

ভূপৃষ্ঠের উপর আমরা যে ভূমিরূপগুলি দেখতে পাই সেগুলি বিভিন্ন ভৌগোলিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলি ভূমিরূপের উৎপত্তিকে প্রভাবিত করায় এগুলিকে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া বলা হয়। ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলি কী কী তা নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে জেনে নেব —

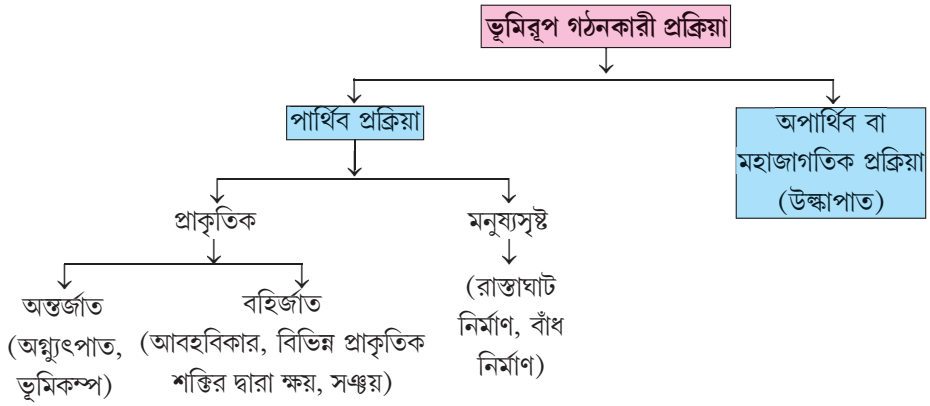

ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলি ভূপৃষ্ঠের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। উৎপত্তি, আকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠের উপর সৃষ্ট ভূমিরূপগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়—

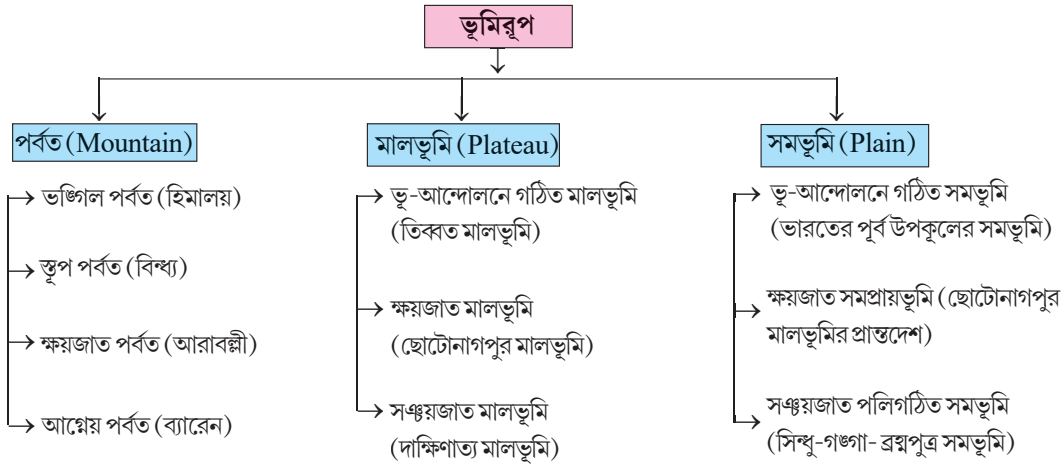

অন্তর্জাত প্রক্রিয়া (Endogenetic processes)

ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যেগুলি ভূঅভ্যন্তর থেকে উৎপত্তি লাভ করে, তাদের অন্তর্জাত প্রক্রিয়া বলে। যেমন — অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প।

বহির্জাত প্রক্রিয়া (Exogenetic processes)

ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যেগুলি ভূপৃষ্ঠে ক্রিয়াশীল থেকে ভূমিরূপ গঠনে প্রভাব বিস্তার করে বা ভূমিরূপের বিবর্তন ঘটায় তাদের বহির্জাত প্রক্রিয়া বলে। যেমন— আবহবিকার, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি (নদী, হিমবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ) দ্বারা ক্ষয়, সঞ্চয়।

পর্বত (Mountain)

সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ১০০০ মিটার বা তার থেকে বেশি উঁচু, সুবিস্তৃত, বন্ধুর ভূমিরূপকে **পর্বত** বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মহাদেশেই পর্বতের উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন- এশিয়ার হিমালয়, উত্তর আমেরিকার রকি, ইউরোপের আল্পস প্রভৃতি। পর্বতের উৎপত্তির কারণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে পর্বতকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়।

পর্বত

১. **ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains)** 'ভঙ্গিল' শব্দটি এসেছে 'ভাঁজ' (Fold) থেকে। সাধারণত গিরিজনি আলোড়নের ফলে পাললিক শিলাস্তরে ভাঁজ পড়ে ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর সাধারণত কোনো অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত পাললিক শিলাস্তরে পার্শ্বচাপের প্রভাবে তরঙ্গ সদৃশ যে অবয়ব সৃষ্টি হয় তাকে ভাঁজ বলে।

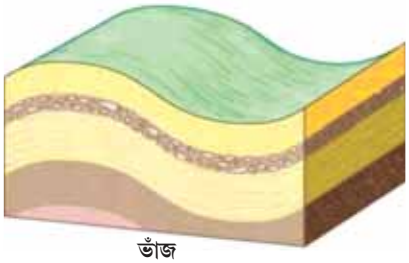

ভাঁজ

ভঙ্গিল পর্বত

উৎপত্তির প্রক্রিয়া

তোমরা জানো ভূপৃষ্ঠ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত এবং এই খণ্ডগুলি ভূঅভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারে চলমান অবস্থায় আছে। এই খন্ডগুলিকে বলা হয় **পাত (Plate)**। পাতগুলি বিভিন্ন দিকে গতিশীল হয়ে নানা ধরনের ভূগাঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। যেমন - ভঙ্গিল পর্বত, আগ্নেয়দ্বীপ ইত্যাদি। যখন দুটি সমধর্মী পাত (মহাদেশীয়-মহাদেশীয় বা মহাসাগরীয়-মহাসাগরীয়) অথবা ভিন্নধর্মী পাত (মহাদেশীয়-মহাসাগরীয়) একে অপরের দিকে গতিশীল হয় তখন তাদের **অভিসারী পাত (Converging plate)** বলে। যে সীমানা বরাবর এই পাত দুটি মিলিত হয় তাকে অভিসারী পাতসীমানা (Converging plate boundary) বলে। এই ধরনের দুটি অভিসারী পাতের মাঝে অবস্থিত কোনো সাগরে সঞ্চিত পলি দুপাশের পাতের পার্শ্বচাপে ভাঁজপ্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি করে ভঙ্গিল পর্বত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — বর্তমানে আমরা যেখানে হিমালয় পর্বতের অবস্থান দেখি, ভূপৃষ্ঠের সেই স্থানে আজ থেকে প্রায় কয়েক কোটি বছর আগে ছিল একটি পলিসঞ্চিত অগভীর সমুদ্র,

যার নাম ছিল টেথিস (Tethys)। এই অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত পলি, দু-পাশে অবস্থিত ভারতীয় ও ইউরেশীয় এই দুটি মহাদেশীয় অভিসারী পাতের চাপে ভাঁজপ্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে **হিমালয় পর্বত**।

মহাদেশ—মহাসাগর সংঘর্ষ

মহাদেশ — মহাদেশ সংঘর্ষ

২. স্তূপ পর্বত (Block Mountain)

ভূত্বকে পাশাপাশি বা সমান্তরালভাবে সৃষ্ট চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ উত্থিত হয়ে বা পাশের অংশ বসে গিয়ে সৃষ্টি হয় স্তূপ পর্বত। ভূ-আলোড়নের প্রভাবে ভূত্বকে সৃষ্ট কোনো ফাটল বরাবর শিলাস্তূপের অনুভূমিক বা উল্লম্ব সরণ ঘটলে তাকে চ্যুতি (Fault) বলে।

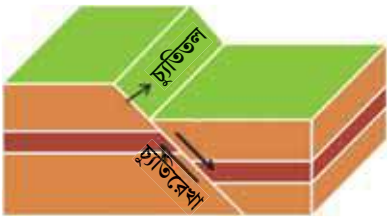

চ্যুতি

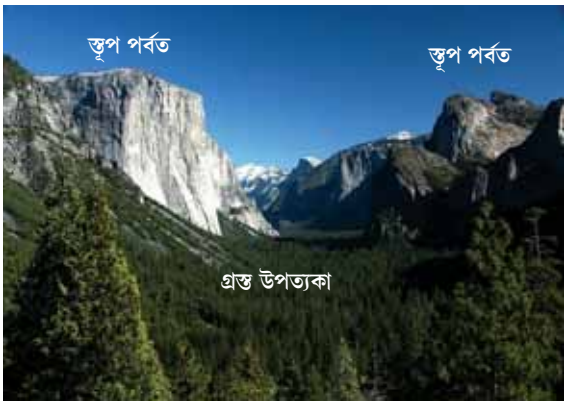

দুটি স্তূপ পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকাকে বলা হয় গ্রস্ত উপত্যকা (Rift Valley)। যেমন — ভারতের বিন্ধ্য ও সাতপুরা হলো স্তূপ পর্বত এবং এই দুই পর্বতের মাঝে অবস্থিত নর্মদা নদীর উপত্যকা হলো গ্রস্ত উপত্যকার উদাহরণ।

৩. ক্ষয়জাত পর্বত (Erosional Mountain)

ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো উচ্চভূমি (পর্বত, মালভূমি) যখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি (নদী, হিমবাহ, বায়ু ইত্যাদি) দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতা ও বন্ধুরতাবিশিষ্ট পর্বত হিসেবে অবস্থান করে তখন তাকে ক্ষয়জাত বা অবশিষ্ট পর্বত বলে। যেমন — ভারতের আরাবল্লী পর্বত।

আরাবল্লী পর্বত

উৎপত্তির প্রক্রিয়া

ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো পর্বত, মালভূমি বা উচ্চভূমি প্রাকৃতিক শক্তির (Natural Agents) প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়জাত পর্বত (ভারতের আরাবল্লী) সৃষ্টি করে। এছাড়াও, অনেকসময় ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো নরম শিলাস্তরের (পাললিক শিলা) মধ্যে আগ্নেয় শিলার অনুপ্রবেশ ঘটলে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে উপরের পাললিক শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং নীচের আগ্নেয় শিলাস্তর ভূপৃষ্ঠে উন্মুক্ত হয়ে ক্ষয়জাত পর্বতের উৎপত্তি ঘটায়। যেমন — উত্তর আমেরিকার হেনরি পর্বত।

৪. **শৈলশিরা ও আগ্নেয় পর্বত (Ridge and Volcanic Mountains) —** ভূঅভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত ম্যাগমা ভূত্বকের কোনো ফাটলের মধ্যে দিয়ে লাভারূপে বেরিয়ে এসে, ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়ে যে পর্বত সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে। ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে লাভারূপে বেরিয়ে এসে সঞ্চিত হয়ে এই পর্বত সৃষ্টি হওয়ায় একে সঞ্চয়জাত পর্বতও বলা হয়।

আগ্নেয় পর্বত

উৎপত্তির প্রক্রিয়া

আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পাতের চলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। দুটি পাত যখন একে অপরের থেকে দূরে সরে যায় বা প্রতিসারী হয় তখন মধ্যবর্তী ফাটল বরাবর ম্যাগমা লাভারূপে বেরিয়ে এসে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরা সৃষ্টি করে। যেমন — মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা। ভূমিরূপবিদদের মতে, অভিসারী পাতসীমানা বরাবর যখন একটি ভারী পাত অপেক্ষাকৃত হালকা পাতের নীচে চলে যায়, তখন এই নিমজ্জমান অঞ্চলে (Subduction Zone) কখনো কখনো বিদার (Fissure) বা ফাটল সৃষ্টি হয়। এই ফাটল বরাবর ভূ-অভ্যন্তরস্থ ম্যাগমা লাভারূপে ভূপৃষ্ঠে উঠে এসে সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি করে। যেমন — মাউন্ট ভিসুভিয়াস।

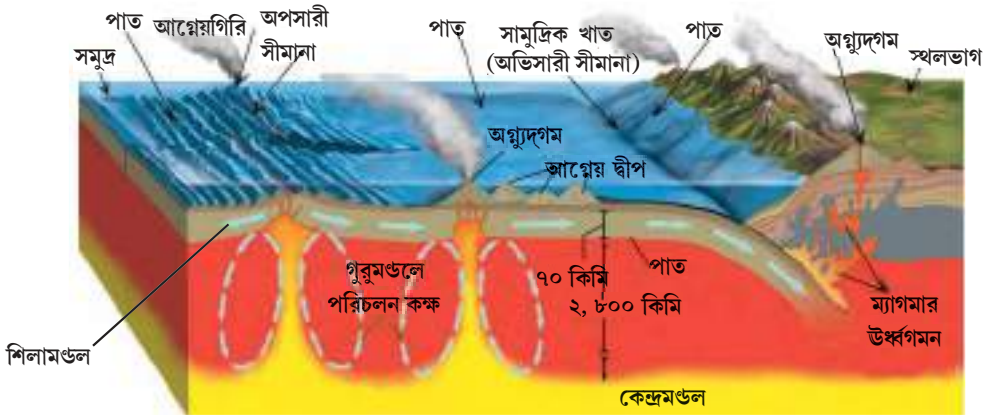

মালভূমি (Plateau)

সমুদ্রতল থেকে ৩০০-৬০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট, উপরিভাগ প্রায় সমতল ও খাড়া পার্শ্বঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূভাগ মালভূমি নামে পরিচিত। যেমন — ছোটোনাগপুর মালভূমি। ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত মালভূমিগুলি ভূ-আন্দোলনের ফলে, ক্ষয়ের ফলে বা সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ উৎপত্তির তারতম্যের উপরে নির্ভর করে মালভূমিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১. ভূআন্দোলনের ফলে সৃষ্ট মালভূমি (Tectonic Plateau)

ভূআন্দোলনের ফলে অনেকসময় ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি অংশ উত্থিত হয়ে মালভূমি সৃষ্টি করে। যেমন— পর্বতবেষ্টিত মালভূমি। ভঙ্গিল পর্বতের উত্থানের সময় দুই বা ততোধিক ভঙ্গিল পর্বতের মাঝে অবস্থিত অগভীর সমুদ্রের পলি গিরিজনি আলোড়নের প্রভাবে সৃষ্ট পার্শ্বচাপের ফলে উত্থিত হয়ে এই মালভূমি সৃষ্টি করে। সাধারণত এই মালভূমি চারিদিকে পর্বত দ্বারা বেষ্টিত থাকায় একে পর্বতবেষ্টিত মালভূমি বলা হয়। যেমন— তিব্বত মালভূমি।

তিব্বত মালভূমি

২. ক্ষয়জাত মালভূমি (Erosional Plateau)

ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো মালভূমি অনেকসময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি (নদী, হিমবাহ, বায়ু) দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়জাত মালভূমি সৃষ্টি করে। ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি হলো একধরনের ক্ষয়জাত মালভূমি। যখন কোনো মালভূমি কয়েকটি সংকীর্ণ নদী উপত্যকা দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি বলে। যেমন — ছোটোনাগপুর মালভূমি।

৩. সঞ্চয়জাত মালভূমি (Depositional Plateau)

ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশে ক্ষয়জাত পদার্থ, লাভা বা তুষার সঞ্চিত হয়ে যে মালভূমি গঠন করে তাকে সঞ্চয়জাত মালভূমি বলে। লাভাগঠিত মালভূমি একধরনের সঞ্চয়জাত মালভূমি। ভূত্বকে সৃষ্ট কোনো বিদারের মাধ্যমে ম্যাগমা লাভারূপে বেরিয়ে এসে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়ে এই মালভূমির সৃষ্টি করায় একে লাভা মালভূমি বলে। যেমন — ডেকান মালভূমি।

ডেকান মালভূমি

সমভূমি (Plains)

সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত সুবিস্তৃত, প্রায় সমতল ও অতি মৃদু ঢালবিশিষ্ট ভূভাগকে সমভূমি বলা হয়। যেমন — সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি।

পৃথিবীর বেশিরভাগ সমভূমি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট, তবে কিছু জায়গায় ভূ-আন্দোলনে সৃষ্ট বা ক্ষয়জাত সমভূমিও দেখা যায়। উৎপত্তি বা সৃষ্টির কারণের উপর ভিত্তি করে সমভূমিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

১. ভূ-আন্দোলনের ফলে গঠিত সমভূমি (Tectonic Plain)

ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ উত্থিত বা অবনমিত হয়ে সমভূমি সৃষ্টি করলে তাদের যথাক্রমে উন্নত ও অবনত সমভূমি বলে। যেমন — তুরানের নিম্নভূমি (অবনত সমভূমি), ভারতের পূর্ব উপকূলের সমভূমি (উন্নত সমভূমি)।

ভারতের উপকূলীয় সমভূমি

তুরানের নিম্নভূমি

২. **ক্ষয়জাত সমভূমি (Erosional Plain)**

ভূপৃষ্ঠের কোনো উঁচু অংশ প্রাকৃতিক শক্তি (নদী, বায়ু, হিমবাহ) দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সমভূমির আকার ধারণ করলে তাকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে। যেমন — ছোটোনাগপুর মালভূমির প্রান্তভাগ।

ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত কোনো উচ্চভূমি নদী দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যে প্রায় সমতল ভূভাগ সৃষ্টি করে তাকে **সমপ্রায়ভূমি (Peneplain)** বলে। 'Peneplain' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন ভূমিরূপ বিজ্ঞানী W. M. Davis।

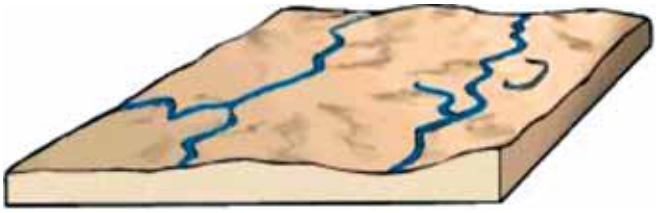

সমপ্রায়ভূমি

৩. **সঞ্চয়জাত সমভূমি (Depositional Plain)**

বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়জাত পদার্থসমূহ ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি সৃষ্টি করে তাকে **সঞ্চয়জাত সমভূমি** বলে। নদী দ্বারা বাহিত পদার্থ বা পলি নদী উপত্যকায় সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি করে পলিগঠিত সমভূমি। যেমন — সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি।

মনে রাখা জরুরি :

- ভূমিরূপ — ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের গঠনগত আকৃতি।
- ভাঁজ — পাললিক শিলাস্তরে পার্শ্বচাপের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গসদৃশ অবয়বকে ভাঁজ বলে।
- পাত — ভূত্বক কতগুলি পাতসদৃশ খণ্ডে বিভক্ত যেগুলি ভূ-অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রভাবে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারে চলমান অবস্থায় আছে।

তোমরা এই বিষয়ে নবম শ্রেণির 'ভূমিরূপ' অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ একটি অর্ন্তজাত প্রক্রিয়ার উদাহরণ হলো —

(ক) নদী (খ) ভূমিকম্প (গ) হিমবাহ (ঘ) বায়ু।

১.২ ভারতে অবস্থিত একটি ক্ষয়জাত মালভূমির উদাহরণ হলো—

(ক) দাক্ষিণাত্য মালভূমি (খ) ছোটোনাগপুর মালভূমি (গ) তিব্বত মালভূমি (ঘ) মালব মালভূমি।

১.৩ একটি মহাদেশীয় ও একটি মহাসাগরীয় পাত সংঘর্ষে লিপ্ত হলে সেই পাতসীমানাকে বলে—

(ক) মহাদেশীয়-মহাদেশীয় অভিসারী পাত সীমানা

(খ) মহাদেশীয়-মহাসাগরীয় অভিসারী পাত সীমানা

(গ) মহাসাগরীয়-মহাসাগরীয় অভিসারী পাত সীমানা

(ঘ) মহাদেশীয়-মহাসাগরীয় অপসারী পাত সীমানা

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.১.১ ভূত্বক কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত, এই খণ্ডগুলিকে কী বলে?

২.১.২ হিমালয় পর্বত কোন অগভীর সমুদ্র থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে?

২.২ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.২.১ পলিগঠিত সমভূমি _____ সমভূমির উদাহরণ।

২.২.২ ভূত্বকে সৃষ্ট ফাটল বরাবর শিলাস্তূপের সরণ ঘটলে তাকে _____ বলে।

২.২.৩ একটি অবনত সমভূমির উদাহরণ হলো _____।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৩.১ 'ভাঁজ' বলতে কী বোঝো নিজের ভাষায় লেখো।

৩.২ সমপ্রায়ভূমি কীভাবে সৃষ্টি হয়?

৩.৩ অন্তর্জাত ও বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করো।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

৪.১ সমভূমির তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪.২ ক্ষয়জাত মালভূমি ও সঞ্চয়জাত মালভূমির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫. নীচের প্রশ্নটির উত্তর লেখো :

৫.১ চিত্রসহ আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

4 শিলা ও মাটির পরিচয়

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- শিলার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবে।
- বিভিন্ন শিলা শনাক্ত করতে পারবে।
- বিভিন্ন শিলা দ্বারা গঠিত ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবে।
- মাটি সৃষ্টির নিয়ন্ত্রকগুলির বর্ণনা করতে পারবে।

শিলা

পৃথিবী যে শক্ত আবরণে ঢাকা তা হলো **শিলা (Rock)**। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এক বা একাধিক খনিজের সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব মিশ্রণ হলো এই শিলা। আর যে **খনিজ (Mineral)** দিয়ে শিলা গঠিত তা হলো এক বা একাধিক অজৈব মৌলিক পদার্থের যৌগ। যেমন — গ্রানাইট শিলা কোয়ার্টজ, ফেল্ডসপার, মাইকা ও হর্নব্লেন্ড খনিজ দ্বারা গঠিত।

শিলা বিভিন্ন প্রকারের হয়। বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টির উপর ভিত্তি করে শিলাকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা যায় —

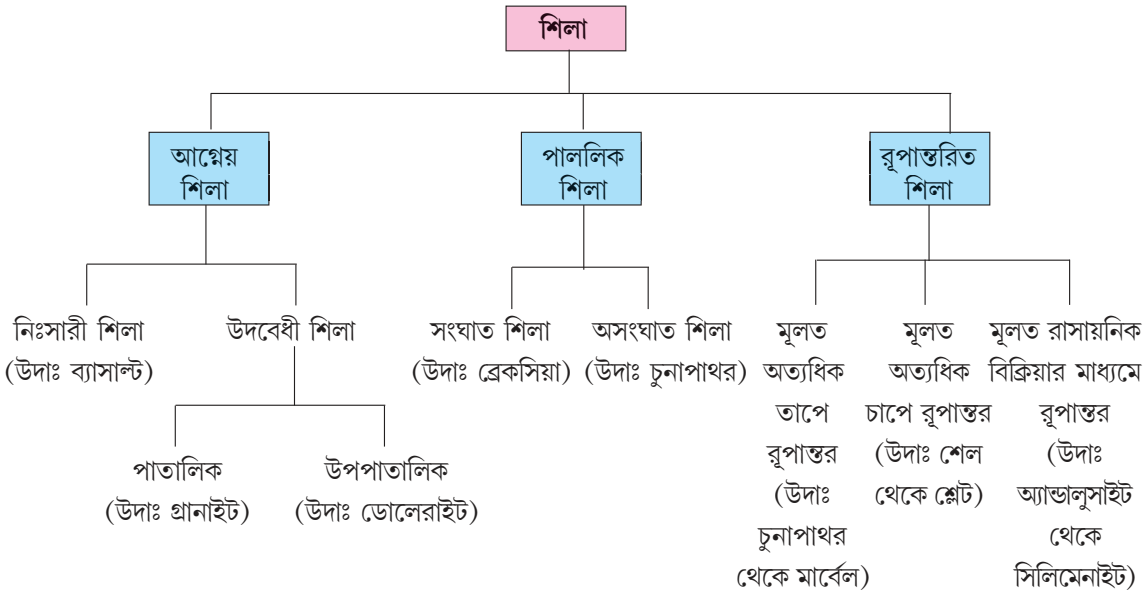

শিলা	পরিচয়	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	
আগ্নেয় শিলা	পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে উত্তপ্ত তরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণ করে যে কঠিন শিলার সৃষ্টি হয় তা হলো আগ্নেয় শিলা। উদাহরণ — গ্রানাইট, ব্যাসল্ট, ডোলেরাইট।	• আগ্নেয় শিলা শক্ত ও ভারী এবং ঘনত্ব খুব বেশি। • এই শিলায় উল্লম্ব দারণ বা ফাটল দেখা যায়, তাই এর প্রবেশ্যতা বেশি। • এই শিলার ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতাও যথেষ্ট বেশি।	
পাললিক শিলা	সমুদ্র, হ্রদ বা নদীর তলদেশে ক্ষয়-প্রাপ্ত পদার্থ স্তরে স্তরে জমে এবং ওপরের জলরাশির চাপের ফলে জমাট বেঁধে এই শিলার সৃষ্টি করে। উদাহরণ — কাদাপাথর, বেলেপাথর, চুনাপাথর।	• স্তরে স্তরে সৃষ্টি হওয়ায় এই শিলায় স্তরায়ন লক্ষ করা যায়। • এই শিলার প্রবেশ্যতা ও সছিদ্রতা খুব বেশি। • এই শিলার মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের ছাপ দেখা যায়, যা জীবাশ্ম নামে পরিচিত। • এই শিলার স্তরে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।	
রূপান্তরিত শিলা	আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূঅভ্যন্তরের প্রচণ্ড চাপ, তাপ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তার পুরোনো ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট শিলায় পরিণত হয়। উদাহরণ — মার্বেল, নিস, অ্যাম্ফিবোলাইট।	• প্রচণ্ড চাপ ও তাপে রূপান্তরের ফলে এই শিলার মধ্যে কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। • আগ্নেয় শিলা রূপান্তরিত হলে আরও বেশি মসৃণ, চকচকে হয়ে যায়। • প্রচণ্ড তাপে ও চাপে রূপান্তরের সময়, পাললিক শিলার মধ্যে থাকা জীবাশ্মগুলি নষ্ট হয়ে যায়।	

শিলার গুরুত্ব

মানবজীবনে শিলার গুরুত্ব অপরিসীম —

- **গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট** শিলামধ্যস্থ কোয়ার্টজ গয়না তৈরিতে, কাঁচ ও পাথর কাটতে কাজে লাগে। এছাড়াও অভ্র, ফেল্ডসপার প্রভৃতি খনিজের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়।
- বিভিন্ন রঙের **চুনাপাথর** যেমন — সাদা, সবুজ, ধূসর ইত্যাদি সিমেন্ট তৈরিতে কাজে লাগে এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- চুনাপাথরের রূপান্তরিত রূপ **মার্বেল** আমরা মেঝে (floor) তৈরিতে, বিভিন্ন সৌধ বানাতে ব্যবহার করে থাকি।
- **বেলেপাথর** বিভিন্ন রঙের হয়; যেমন লাল, হলুদ ইত্যাদি। এগুলিও স্থাপত্য, স্মৃতিসৌধ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। দিল্লির লালকেল্লা, খাজুরাহোর মন্দির বেলেপাথরে তৈরি।
- এছাড়া **কাদাপাথরকেও** আমরা নির্মাণশিল্পে ব্যবহার করে থাকি। অ্যানথ্রাসাইট কয়লা থেকে রূপান্তরিত গ্রাফাইট নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

মাটি

বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন — সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, নদী, সমুদ্রতরঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর এই ভেঙে যাওয়া শিলাচূর্ণের স্তরকে **রেগোলিথ** বলে। নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রেগোলিথ থেকেই মাটির সৃষ্টি হয়।

আজকের শিলা ভবিষ্যতে মাটির রূপ নেয়। তাই শিলার প্রকৃতির ওপর মাটির বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নির্ভর করে। যেমন— সাধারণত ব্যাসল্ট শিলা থেকে কালোমাটি, গ্রানাইট শিলা থেকে লালমাটি, বেলেপাথর থেকে বেলেমাটি তৈরি হয়।

কালোমাটি

লালমাটি

বেলেমাটি

এছাড়াও জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, জীবজগৎ, সর্বোপরি সময় মাটি সৃষ্টির প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

জলবায়ু

জলবায়ু মাটি তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। সাধারণত বৃষ্টিবহুল ও উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে মাটি সৃষ্টিতে সময় কম লাগে কিন্তু শীতল ও শুষ্ক অঞ্চলে মাটি তৈরিতে সময় বেশি লাগে। প্রকৃতপক্ষে মাটি সৃষ্টিতে জলবায়ুর উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত — এই দুই উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভূমির প্রকৃতি

ভূমির প্রকৃতির ওপর বিশেষ করে ঢালের উপর মাটি সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভূমির ঢাল বেশি হলে মাটি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কমে যায়। আবার যেখানে ভূমির ঢাল কম সেখানে শিলা থেকে মাটি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

জীবজগৎ

বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী মাটি সৃষ্টির সহায়ক। উদ্ভিদ যেমন তার শিকড়ের দ্বারা শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সাহায্য করে তেমনি অনেক প্রাণী(কেঁচো, পিঁপড়ে ইত্যাদি) মাটি সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এছাড়াও উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষ বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে, যা পরবর্তীকালে মাটি সৃষ্টির সহায়ক হয়।

সময়

মাটি সৃষ্টিতে হাজার হাজার বছর এমনকি লক্ষ বছরও সময় লেগে যায়। মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র ২ সেন্টিমিটার পুরু মাটির স্তর সৃষ্টিতে প্রায় কয়েকশো বছর সময় লাগে। তাই মাটি সৃষ্টির প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর।

মাটির গুরুত্ব

শিলার ওপর যেমন মাটির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তেমনি মাটির উপর আবার কৃষিকাজ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যেমন — বেলেমাটির দানা মোটা হওয়ায় এবং দানার মধ্যে ফাঁক বেশি থাকায় এই মাটি খুব দ্রুত জল টেনে নেয়। এই মাটিতে আলু, তরমুজ, শশার চাষ করা হয়। সূক্ষ্ম দানার এঁটেল মাটিতে দানার মধ্যে ফাঁক এতটাই কম থাকে যে জল ঢাললে জল দাঁড়িয়ে থাকে। এইধরনের মাটিতে পান, ধান ও অন্যান্য সব্জিরও চাষ হয়। দোয়াঁশ মাটিতে বালি আর কাদার পরিমাণ প্রায় সমান থাকে। এছাড়াও জল, বাতাস ও অন্য উপাদানও ঠিক মাত্রায় থাকে। তাই এই মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য আদর্শ। দোয়াঁশ মাটিতে ধান, পাট, আলু, ডাল ও নানাধরনের সব্জির চাষ বেশ ভালো হয়।

মনে রাখা জরুরি :

- শিলা — প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এক বা একাধিক খনিজের সমসত্ত্ব বা অসমসত্ত্ব মিশ্রণ।
- আগ্নেয় শিলা — পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে উত্তপ্ত তরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে ভূত্বকের মধ্যে ও ভূপৃষ্ঠে প্রথম যে শিলার উৎপত্তি হয়।
- পাললিক শিলা — বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবাহিত হয়ে সমুদ্র বা নদীর তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। উপরের জলরাশির প্রবল চাপে পদার্থ জমাট বেঁধে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে।
- রূপান্তরিত শিলা — আগ্নেয় ও পাললিক শিলা ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রচণ্ড চাপ, তাপ ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তার পুরোনো ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট শিলায় পরিণত হয়।

নবম শ্রেণির 'ভূমিরূপ' ও 'আবহবিকার' - অধ্যায় দুটি অধ্যয়নের সময় শিলা ও মাটির পরিচয় সম্বন্ধীয় আলোচনা তোমাদের সাহায্য করবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ যে শিলা থেকে কালোমাটি সৃষ্টি হয়েছে তা হলো -

(ক) গ্রানাইট (খ) চুনাপাথর (গ) ব্যাসল্ট (ঘ) বেলেপাথর ।

১.২ জীবাশ্ম দেখা যায় যে শিলায় তা হলো -

(ক) কাদাপাথর (খ) নিস (গ) গ্রানাইট (ঘ) ব্যাসল্ট।

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ বেলেপাথর _____ শিলার উদাহরণ।

২.১.২ মার্বেল _____ শিলার উদাহরণ।

২.২ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ ভূ-অভ্যন্তরের শুধু প্রচণ্ড চাপের ফলেই শিলা রূপান্তরিত হয়।

২.২.২ নানা ধরনের মৃত্তিকা বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.৩.১ চুনাপাথরের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

২.৩.২ একটি নিঃসারী আগ্নেয় শিলার উদাহরণ লেখো।

৩ নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৩.১ কীভাবে আগ্নেয় শিলা সৃষ্টি হয় ?

৩.২ রূপান্তরিত শিলার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর লেখো :

৪.১ আগ্নেয় ও পাললিক শিলার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো।

নমুনা প্রশ্নপত্র ২

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ অ্যানথ্রাসাইট কয়লা রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি হয় —

ক) গ্রানাইট খ) গ্রাফাইট গ) কোয়ার্টজাইট ঘ) অ্যাম্ফিবোলাইট।

১.২ ভারতের একটি উচ্চ মালভূমি হলো —

ক) লাদাখ খ) ছোটোনাগপুর গ) মালব ঘ) দাক্ষিণাত্য।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ চ্যুতিরেখা যে তলের উপর অবস্থান করে তাকে _____ বলে।

২.১.২ গ্রানাইট শিলার একটি খনিজ হলো _____।

২.২ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ অধিক ভূমিঢাল দ্রুত মাটি সৃষ্টির সহায়ক।

২.২.২ অভিসারী পাতসীমান্ত বরাবর ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয়।

২.৩ একটি বা দুটি শব্দ উত্তর দাও :

২.৩.১. ভারতে অবস্থিত একটি গ্রস্ত উপত্যকার উদাহরণ লেখো।

২.৩.২ ব্যাসল্ট শিলা থেকে সাধারণত কোন মাটি সৃষ্টি হয়?

২.৪ ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ মেলাও :

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
২.৪.১ অবনত সমভূমি	১. মাটি
২.৪.২ আগ্নেয় শিলা	২. ভূমিকম্প
২.৪.৩ অন্তর্জাত প্রক্রিয়া	৩. ব্যাসল্ট
২.৪.৪ রেগোলিথ	৪. তুরানের নিম্নভূমি

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

৩.১ উদাহরণসহ পাললিক শিলার দুটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

৩.২ পর্বতের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

৪.১ একটি চার্টের সাহায্যে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়াগুলির শ্রেণিবিভাগ করো।

৪.২ 'মাটির চরিত্রের উপর কৃষিকাজ নির্ভরশীল' — উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করো।

৫. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

৫.১ চিত্রসহ ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো।

৫.২ মাটির সৃষ্টিতে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

5 পরিবেশের অবনমন ও মানুষের উপর তার প্রভাব

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- পরিবেশের অবনমনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- পরিবেশদূষণের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করতে পারবে এবং দূষক পদার্থগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং এই বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে।

প্রাচীনকালে আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতো প্রকৃতির দ্বারা। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতি এবং মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করার চেষ্টা শুরু করে এবং প্রকৃতির উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে থাকে।

সভ্যতার অগ্রগতি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির গুণমান হ্রাস পেতে থাকে। পরিবেশের গুণমানের এই অধঃপতনকেই **পরিবেশের অবনমন** (Environmental Degradation) বলা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি এমনভাবে কাজ করে যাতে পরিবেশের কোনো অংশের ক্ষতি বা পরিবর্তন হলে তা নিজে থেকেই পূরণ হয়ে যায়। একে **'হোমিওস্ট্যাটিক ব্যবস্থা'** বলে। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যথেচ্ছ সম্পদ আহরণের চেষ্টা ও মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কার্যকলাপ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে পরিবেশের উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য আর স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে আসতে পারে না, এর প্রভাবেই **'পরিবেশের অবনমন'** হয়। যদিও কিছু প্রাকৃতিক ও আধা-প্রাকৃতিক ঘটনাও অনেক সময় পরিবেশের অবনমন ঘটাতে সাহায্য করে, যেমন — অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

পরিবেশের অবনমন দীর্ঘ সময় ধরে যদি চলতে থাকে তাহলে তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য নষ্ট হয় ও জীববৈচিত্র্যের বিনাশ ঘটে।

পরিবেশের অবনমন

'পরিবেশের অবনমন' বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি করে। যেমন — জীববৈচিত্র্য হ্রাস, মরুকরণ ইত্যাদি। কিন্তু এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায় তখনই যখন তা মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় প্রধান উপাদানগুলির স্বাভাবিক ধর্মকে পরিবর্তন করে দেয় এবং তা মানবজীবনে ঋণাত্মক বা ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করে দূষণের মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সময়ে বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মৃত্তিকাদূষণ ও শব্দদূষণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এর প্রত্যক্ষ প্রভাবের নিদর্শন।

দূষণ (Pollution)

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভৌত, জৈব ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তনের প্রভাব যখন মানবজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন তাকে **দূষণ** বলে। এগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে।

বায়ুদূষণ

বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ যেমন দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস (CO, SO_2, CFC) এবং ধূলিকণা বায়ুর সঙ্গে মিশে বায়ুর স্বাভাবিক ধর্মগুলির (ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব) এমনভাবে পরিবর্তন ঘটায় যা মানবজীবনের ক্ষতিসাধন করে, একে বলে বায়ুদূষণ।

বায়ুদূষণ

জলদূষণ

প্রাকৃতিক জলাশয়ে কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থের অনুপ্রবেশের ফলে জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব উপাদানগুলির ঋণাত্মক পরিবর্তন হলে বা জলের গুণমান হ্রাস পেলে তাকে জলদূষণ বলে।

আমাদের গৃহস্থালীর বর্জ্য (রান্নার তেল মিশ্রিত বর্জ্য জল), শিল্প কারখানার বর্জ্য, কৃষিজাত বর্জ্য (রাসায়নিক সারমিশ্রিত জল), বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জল; পুকুর, হ্রদ বা নদীতে মিশে জলদূষণ ঘটায়।

জলদূষণ

মাটিদূষণ

মাটির সঙ্গে কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ (যেমন — রাসায়নিক বর্জ্য, দূষিত জল) মিশে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব উপাদানের গুণমান নষ্ট করলে তাকে মাটিদূষণ বলে। দূষিত মাটিতে উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে দূষক মানবদেহে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

মাটিদূষণ

শব্দদূষণ

শব্দের বিভিন্ন উৎস (যেমন- লাউডস্পিকার, গাড়ির হর্ন, আতসবাজি) থেকে উৎপন্ন জোরালো শব্দ যখন মানুষের শ্রবণশক্তির সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, তখন তাকে শব্দদূষণ বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ৬৫ ডেসিবেলের অধিক মাত্রাবিশিষ্ট শব্দ যদি দীর্ঘসময় ধরে স্থায়ী হয় তাহলে তা **বধিরতা (Deafness)** সৃষ্টি হতে পারে।

শব্দদূষণ

পরিবেশের অবনমন সংক্রান্ত একটি ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

দিল্লির শীতকালীন ধোঁয়াশা (Smog)

পৃথিবীর বড়ো বড়ো শহরগুলিতে বিশেষত শীতকালে ধোঁয়াশা (ধোঁয়াশা = ধোঁয়া + কুয়াশা) সৃষ্টি একটি পরিবেশগত অবনমনের উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে দিল্লির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক বছর শীতকালে (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি) দিল্লিতে

ধোঁয়াশা এমন মাত্রায় পৌঁছায় যে দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কমে যায়, এমনকি সকাল ৯-১০ টার সময়ও যান চলাচলের জন্য গাড়ির হেডলাইট জ্বালানোর প্রয়োজন হয়। পরিবেশবিদদের মতে, এই ধোঁয়াশার মধ্যে মিশে থাকা বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদান যেমন — অ্যারোসল, বায়ুতে ভাসমান রাসায়নিক, ছাই প্রভৃতি মানুষের স্বাস্থ্যের উপর স্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করছে।

World Health Organisation (WHO) বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সমীক্ষা অনুযায়ী পৃথিবীর প্রধান ১৬৫০টি শহরের মধ্যে দিল্লি শহরে বায়ুদূষণের মাত্রা সর্বাধিক।

Air Quality Index (AQI) হলো একটি নির্দেশক যার মাধ্যমে বায়ুদূষণের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। সাধারণভাবে AQI- এর মান ০-১৫০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার -এর মধ্যে থাকলে তা কম ক্ষতিকারক। তথ্য অনুযায়ী মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দিল্লি শহরের AQI সহনশীল মাত্রায় থাকলেও অক্টোবর মাসের পর থেকে তা বাড়তে শুরু করে এবং কোনো কোনো দিনে AQI- এর মান ৪০০-৫০০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার পর্যন্ত হয়ে যায়, যাকে পরিবেশের চরম অবনমন বলে চিহ্নিত করা হয়।

২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লির AQI- এর মান ৯৯৯ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার পৌঁছেছিল, এই ঘটনা 'Great Smog of Delhi' নামে পরিচিত।

পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে দিল্লির এই বিপজ্জনক মাত্রার ধোঁয়াশা সৃষ্টির কারণগুলি হলো —

- উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৃষি জমিতে ফসল জ্বালানো থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া।
- কলকারখানা থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া।
- যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া।
- দিল্লির শীতকালীন বাতাসের তুলনামূলক ঠান্ডা ও ভারী হাওয়া।

উপরিউক্ত উৎসগুলি থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া শীতকালে কুয়াশার (Fog) সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করে ধোঁয়াশা (Smog)।

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ধোঁয়াশার প্রভাব

সমীক্ষা অনুযায়ী বলা যায় এই ধোঁয়াশা —

- শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে।
- বড়োদের ক্ষেত্রে ফুসফুসের রোগ, হাঁপানি, ক্যানসার এমনকি মৃত্যুরও কারণ হিসেবে কাজ করছে।

দিল্লির ধোঁয়াশা

বিভিন্ন প্রকার দূষকের উপস্থিতি, অনুপযুক্ত ভূমি ব্যবহার, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদির কারণে পরিবেশের ব্যাপক বা অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।

পরিবেশের অবনমন নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি হলো —

- মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, দারিদ্র দূরীকরণে সচেষ্ট হতে হবে।
- পরিবেশবান্ধব শক্তির (সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, ইত্যাদি) ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- সম্পদের পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রাকৃতিক প্রবহমান সম্পদ, যেমন — জল, বায়ু ইত্যাদির গুণমান বজায় রাখতে হবে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- দেশের সরকারকে পরিবেশ সংক্রান্ত নানা পরিকল্পনা রূপায়ণে গুরুত্ব দিতে হবে।
- জনসংখ্যা ও সম্পদের ব্যবহারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

''উন্নয়ন এমনভাবেই করতে হবে যাতে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের সঙ্গে আপোস না করতে হয়।'' ব্রুন্টল্যান্ড কমিশনের 'আওয়ার কমন ফিউচার' নামক রিপোর্টে একেই স্থিতিশীল উন্নয়ন বলা হয়েছে। ২০১২-তে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত স্থিতিশীল উন্নয়ন বিষয়ক অর্থ সামিট'-এ এই বিষয়ের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা যা করতে পারি —

- ♦ নিজের স্কুল ও বাড়ির চারিপাশ পরিষ্কার রাখা।
- ♦ উপযুক্ত জায়গায় গাছ লাগানো ও তার দেখাশোনা করা।
- ♦ বিদ্যুৎ, জল যাতে অপচয় না হয় তার দিকে লক্ষ রাখা।
- ♦ বাড়ির বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ কমানো।
- ♦ নিজের স্কুলে পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচনা সভা, বিতর্কসভা আয়োজন করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

মনে রাখা জরুরি :

- পরিবেশ অবনমন — পরিবেশের উপাদানগুলির গুণমানের ঋণাত্মক পরিবর্তন বা হ্রাস।
- দূষণ — প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবাঞ্ছিত পদার্থের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পরিবেশের উপাদানগুলির গুণমানের অবনমন ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন।
- দূষক — পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অবাঞ্ছিত উপাদান।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ পরিবেশের অবনমনের একটি প্রাকৃতিক কারণ হলো —

(ক) ভূমিধস (খ) কৃষিকাজ (গ) শিল্প (ঘ) যানবাহন।

১.২ একটি বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস হলো —

(ক) CO (খ) O_2 (গ) N_2 (ঘ) H_2

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ সম্পদের _____ মাধ্যমে পরিবেশের অবনমন হ্রাস করা যায়।

২.১.২ শব্দদূষণের ফলে সৃষ্ট একটি রোগ হলো _____।

২.২ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.২.১ যে সমস্ত উপাদানগুলি দূষণ সৃষ্টি করে তাদের কী বলে?

২.২.২ সহনশীল মাত্রার AQI-এর মান কত?

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৩.১ দূষণ কাকে বলে?

৩.২ জলদূষণের প্রধান কারণগুলি কী কী?

৩.৩ পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ অবনমনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪. সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো :

৪.১ কীভাবে পরিবেশের অবনমন ঘটে?

৪.২ দিল্লির শীতকালীন ধোঁয়াশার কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪.৩ কয়লার সাহায্যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কীভাবে পরিবেশ অবনমনের কারণ হয়ে উঠতে পারে তা উদাহরণের সাহায্যে লেখো।

6 ভারতের অবস্থান ও প্রতিবেশী দেশসমূহ

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- এশিয়ার মানচিত্রে ভারতের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।
- ভারতের অবস্থানের সাপেক্ষে প্রতিবেশী দেশগুলির অবস্থান উল্লেখ করতে পারবে।
- প্রতিবেশীদেশগুলির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবে।
- ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

তোমরা সবাই জানো যে, আমাদের দেশ ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতের অবস্থান

ভারত পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত একটি দেশ। ৬°৪৬′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৩৭°৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭′ পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯৭°২৫′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু কন্যাকুমারী ৮°৫′ উত্তর এবং ভারতের দক্ষিণতম স্থলবিন্দু আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ইন্দিরা পয়েন্ট ৬°৪৬′ উত্তরে অবস্থিত ।

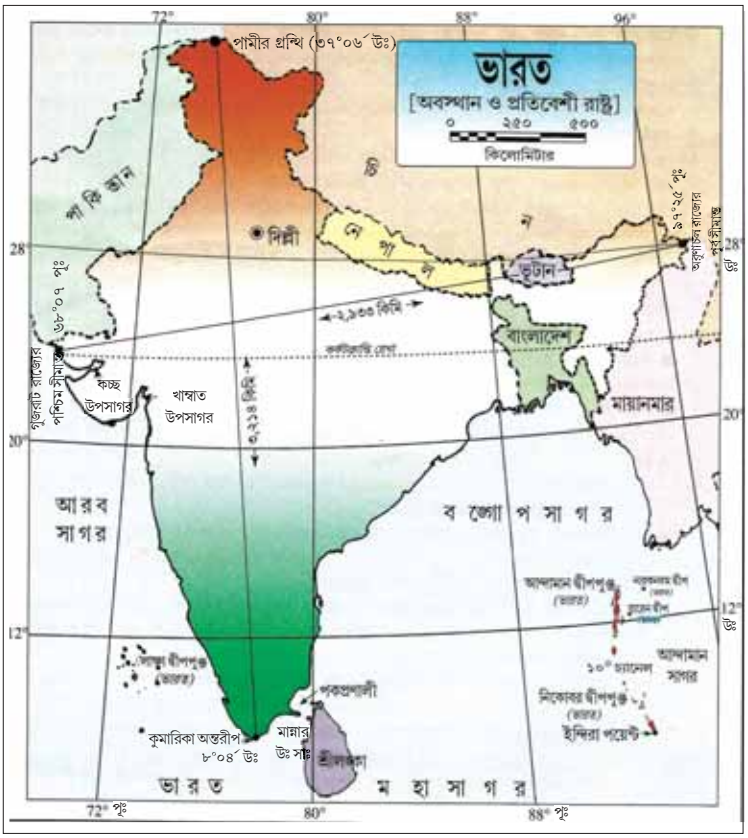

ভারতের সীমানা

ভারতের উত্তর দিকে আছে হিমালয় পর্বত, নেপাল, ভুটান ও চিন; উত্তর-পশ্চিমে অবস্থান করছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ; পশ্চিম দিকে রয়েছে আরব সাগর; দক্ষিণদিকে রয়েছে ভারত মহাসাগর, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ; পূর্বদিকে অবস্থান করছে বঙ্গোপসাগর, মায়ানমার ও বাংলাদেশ।

ভারতকে তার ক্ষেত্রফলের বিশালতা, ভূপ্রাকৃতিক, জলবায়ুগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রভৃতির জন্য 'উপমহাদেশ' বলা হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশকে 'পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণও' বলা হয়।

আমাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব

দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র হিসেবে ভারত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের চারপাশে অবস্থিত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে প্রধানত আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এছাড়া অনেকগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের (নেপাল, চিন, ভুটান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার) সঙ্গে ভারতের সীমানা থাকায় দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশ

ভারতের কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দেশের নাম	উচ্চতম শৃঙ্গ	প্রধান নদী	রাজধানী	প্রধান ভাষা	কৃষিজ ফসল	শিল্প	প্রধান শহর
নেপাল	এভারেস্ট	কালিগন্ডক	কাঠমান্ডু	নেপালি	ধান, পাট, আম, চা, কমলালেবু ইত্যাদি	পর্যটন, কাগজ, কুটির শিল্প	কাঠমান্ডু, পোখরা
ভুটান	কুলাকাংড়ি	মানস	থিম্পু	জোংখা	ধান, ভুট্টা, যব, বড়ো এলাচ, কমলালেবু ইত্যাদি	পর্যটন, সিমেন্ট, কাঠ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	থিম্পু, ফুন্টশোলিং
বাংলাদেশ	কেওক্রাডাং	পদ্মা, মেঘনা	ঢাকা	বাংলা	ধান, পাট, ভুট্টা, গম, জোয়ার, চা, কার্পাস ইত্যাদি	পাট, কাগজ, চিনি, সিমেন্ট, বস্ত্র	ঢাকা, চট্টগ্রাম
শ্রীলঙ্কা	পেড্রু-তালাগালা	মহাবলী	শ্রী জয়বর্ধনে পুরাকোট্টে	সিংহলি	ধান, তৈলবীজ, মশলা, ফল ইত্যাদি	রবার, বস্ত্র, চা	কলম্বো, জাফনা
মায়ানমার	ককোবো-রজি	ইরাবতী	ইয়াঙ্গুন	বার্মিজ	ধান, আম, শাক, সাবু, ফল ইত্যাদি	কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, খনিজভিত্তিক শিল্প	ইয়াঙ্গুন, মান্দালয়
পাকিস্তান	তিরিচিমির	সিন্ধু	ইসলামাবাদ	উর্দু	ধান, গম, আম, ভুট্টা	সিমেন্ট, চিনি, বস্ত্র	ইসলামাবাদ, করাচি

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক

বাংলাদেশ ⇨ তোমরা জানো, বর্তমান বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, তাই ভারত তথা আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সভ্যতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের দিক থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন — কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে।

বাণিজ্য : ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য – নিউজ প্রিন্ট, মাছ, কাঁচা পাট প্রভৃতি এবং ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্য – কৃষিজ দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কয়লা, লৌহ-ইস্পাত ইত্যাদি।

নেপাল ⇨ ভারতের উত্তর দিকে অবস্থিত নেপাল ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী রাষ্ট্র। নেপাল রাষ্ট্রটি চারিদিকে স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা। এর উত্তরে আছে তিব্বত ও চিন এবং পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ রয়েছে ভারতের মূল ভূখণ্ড। অর্থনৈতিক, সামাজিক দিক থেকে ভারতের সঙ্গে নেপালের সুদৃঢ় সম্পর্ক আছে। বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেপাল ভারতের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া নেপালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে ভারত থেকে বহু মানুষ নেপালে বেড়াতে যান, যা নেপালের পর্যটনশিল্পকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

বাণিজ্য : ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য — কাঠ, পশম, দারচিনি, ফল, এলাচ ইত্যাদি এবং ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্য – কৃষিজ দ্রব্য, বস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, ওষুধ ইত্যাদি।

ভুটান ⇨ ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত একটি ছোটো পার্বত্য দেশ হলো ভুটান। এই দেশটির সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন যথেষ্ট দৃঢ়। প্রধানত শিক্ষা, আমদানি-রপ্তানি, পর্যটন, যোগাযোগের মাধ্যমে ভুটান ও ভারতের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভুটান রাষ্ট্রটি নেপালের মতো স্থলবেষ্টিত, তাই ভুটান পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। এছাড়া চুখা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারত ও ভুটানের যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, যা এই দুই দেশের সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নিদর্শন।

বাণিজ্য : ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য- বস্ত্র, কাঠ, পশম, ফল ইত্যাদি এবং ভারতের রপ্তানীকৃত দ্রব্য - রাসায়নিক দ্রব্য, কয়লা, ওষুধ, সিমেন্ট, চিনি ইত্যাদি।

শ্রীলঙ্কা ⇨ ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত এই দ্বীপরাষ্ট্র ভারতের থেকে পক-প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ভারত ও শ্রীলঙ্কা এই দুই রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত দিক থেকে একে অপরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। শ্রীলঙ্কা ভারতের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল।

বাণিজ্য : ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য - কফি, চা, ফল, মশলা, কাঠজাত দ্রব্য ইত্যাদি এবং ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্য - খনিজ তেল, ভোজ্যতেল, ওষুধ, চিনি, যন্ত্রপাতি, লৌহ-ইস্পাত ইত্যাদি।

আফগানিস্তান ⇨ আফগানিস্তান ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারত ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকেই স্থলপথে বাণিজ্যের মাধ্যমে আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

বাণিজ্য : ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য - ফল, তৈলবীজ, পশম ইত্যাদি এবং ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্য - ওষুধ, শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি।

চিন ⇨ ভারতের উত্তরদিকে অবস্থিত চিন আমাদের দেশের বৃহত্তম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশেই এই দুই রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির উপর নির্ভর করে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ও চিনের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতের সিকিম রাজ্যের মধ্যে দিয়ে 'Silk Route' এর মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। প্রাচীনকালে এই রাস্তার মাধ্যমে রেশমজাত দ্রব্য ভারতে ও চিনের মধ্যে আদান প্রদান হতো বলে এর নাম 'সিল্ক রুট'।

বাণিজ্য : ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য - ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোন, সার, মোটরগাড়ি ও যন্ত্রপাতি, জৈব রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি এবং ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্য - পশম, কার্পাস, প্লাস্টিক, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।

পাকিস্তান ⇨ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পাকিস্তান। রাজনৈতিক টানাপোড়েন সত্ত্বেও এই দুই রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

বাণিজ্য : ভারতে আমদানিকৃত দ্রব্য - ফল, লবণ, চুনাপাথর, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য, খনিজ জ্বালানি এবং ভারতের রপ্তানিকৃত দ্রব্য- কার্পাস, প্লাস্টিক, সিমেন্ট।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভারতের সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্ক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে যা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

মনে রাখা জরুরি :

- উপমহাদেশ — উপমহাদেশ হলো মহাদেশের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ যেখানে মহাদেশটির প্রধান ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যগুলির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।
- সিল্ক রুট (Silk Route) — 'সিল্ক রুট' হলো সেই রাস্তা যা দিয়ে অতীতে ভারত ও চীনের মধ্যে রেশমজাত দ্রব্যের বাণিজ্য হতো।
- আমদানি ও রপ্তানি — মুদ্রার বিনিময় কোনো একটি দেশে উৎপাদিত দ্রব্যকে অন্যদেশে পাঠানোকে বলে রপ্তানি ও অন্যদেশ থেকে কোনো দেশে পণ্য নিয়ে আসাকে বলা হয় আমদানি।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ ভারতের বৃহত্তম প্রতিবেশী দেশ হলো —

(ক) বাংলাদেশ (খ) চিন (গ) পাকিস্তান (ঘ) শ্রীলঙ্কা।

১.২ ভারতের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু হলো —

(ক) ইন্দিরা পয়েন্ট (খ) ইন্দিরা কল (গ) কন্যাকুমারী (ঘ) লাক্ষাদ্বীপ।

১.৩ ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলো —

(ক) আফগানিস্তান (খ) নেপাল (গ) ভুটান (ঘ) বাংলাদেশ।

২. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

২.১ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১.১ নেপাল থেকে ভারতে আমদানিকৃত একটি দ্রব্য হলো ———— ।

২.১.২ 'Silk Route' ভারতের ———— রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত।

২.২ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.২.১ শ্রীলঙ্কা একটি দ্বীপরাষ্ট্র।

২.২.২ ভারতের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :**

৩.১ ভারতের অবস্থান উল্লেখ করো।

৩.২ ভারতকে উপমহাদেশ বলা হয় কেন?

৩.৩ প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে শ্রীলঙ্কা কীভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :**

৪.১ ভারতকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হয় কেন?

৪.২ প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক বজায় রাখা কেন প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো?

7 মানচিত্র ও স্কেলের সাধারণ পরিচিতি

তোমরা এই বিষয়টি পড়ার পর :

- মানচিত্রের সংজ্ঞা লিখতে পারবে।
- মানচিত্রের উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।
- মানচিত্রে স্কেলের গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের মানচিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবে।

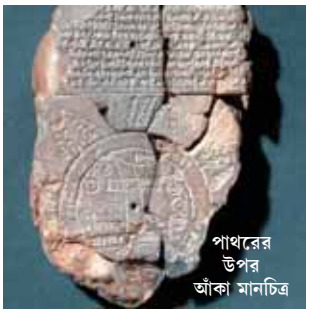

মানচিত্র (Map) শব্দটি ভূগোলের বিভিন্ন বিষয় আলোচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভৌগোলিক তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ব্যাবিলনে একটি পাথরের উপর আঁকা হয়েছিল। 'Map' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ '*mappa*' থেকে, যার অর্থ 'কাপড়'। প্রাচীন সময়ে 'Map' সাধারণত 'কাপড়ের' উপর আঁকা হতো, পরবর্তী সময়ে তা কাগজের উপর আঁকা শুরু হয়।

মানচিত্র কী?

মানচিত্র হলো, ত্রিমাত্রিক ভূ-দৃশ্যাবলীর দ্বিমাত্রিক চিত্রায়ণ। সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলিকে যখন নির্দিষ্ট জ্যামিতিক ও গাণিতিক নিয়মে এবং নির্দিষ্ট স্কেল (Scale) অনুযায়ী সমতল ক্ষেত্র বা কাগজের উপর উপস্থাপন করা হয় তাকেই মানচিত্র বলে।

স্কেলের ধারণা

মানচিত্রের স্কেল বলতে, মানচিত্রে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যেকার দূরত্ব ও ভূমিভাগের উপর ওই দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্বের অনুপাতকে বোঝায়। পাশের ছবিতে, একটি মানচিত্রে দুটি স্থান A ও B-এর দূরত্ব দেখানো হয়েছে। ধরা যাক, মানচিত্রে A ও B-এই দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব ৪ সেমি এবং ভূমিভাগে ওই দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব ২০০০ কিমি।

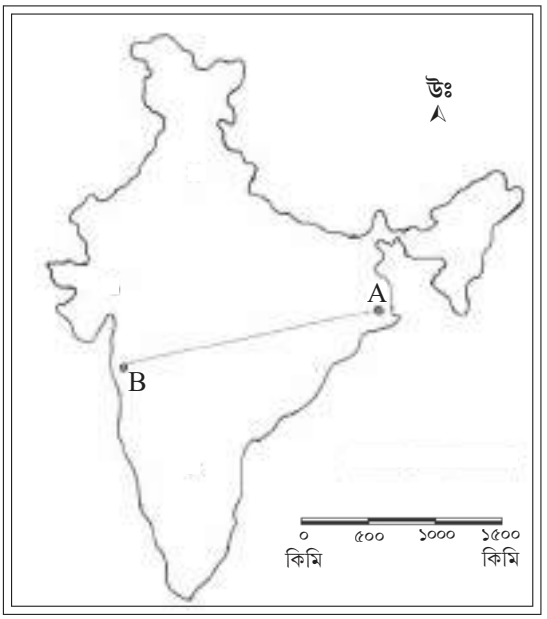

এক্ষেত্রে মানচিত্রটির স্কেল হবে

↓

৪ সেমি = ২০০০ কিমি

∴ ১ সেমি = ৫০০ কিমি (বিবৃতিমূলক স্কেল)

বা, ১ : ৫,০০০,০০০০ (অনুপাতসূচক ভগ্নাংশ)

অর্থাৎ উপরের আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, প্রদত্ত মানচিত্রটিতে ১ সেমি মানচিত্র দূরত্ব ৫০০ কিমি ভূমিভাগের দূরত্বের সমান।

যেকোনো একটি মানচিত্রে স্কেলের উল্লেখ থাকা আবশ্যক, কারণ স্কেলের উল্লেখ না থাকলে সেই মানচিত্র ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঠিক মানচিত্র নয়।

ভূগোলের যে শাখায় এই মানচিত্র নির্মাণ, মানচিত্রের স্কেল, মানচিত্রের উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে **মানচিত্রবিদ্যা (Cartography)** বলে।

স্কেলের শ্রেণিবিভাগ

মানচিত্রের স্কেল বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয় —

১) **বিবৃতিমূলক স্কেল (Statement Scale)**

মানচিত্রে স্কেলকে যখন একটি বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে **বিবৃতিমূলক স্কেল** বলে।

উদাহরণ — ১ সেমি মানচিত্র দূরত্ব ৪ কিমি ভূমিভাগের দূরত্বের সমান।

২) **ভগ্নাংশসূচক স্কেল বা অনুপাতসূচক ভগ্নাংশ (Representative Fraction or R.F.)**

যখন মানচিত্রে স্কেলকে ভগ্নাংশ বা অনুপাতের আকারে প্রকাশ করা হয়, তাকে **ভগ্নাংশসূচক স্কেল** বলে।

উদাহরণ - R.F. = ১ : ৪০০,০০০

৩) **লৈখিক স্কেল (Graphical Scale)**

মানচিত্রে স্কেলকে যখন রেখা (Line) বা লেখচিত্রের (Graph) মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে লৈখিক স্কেল বলে।

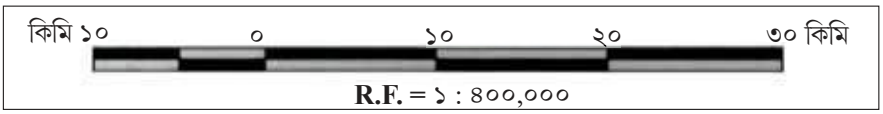

লৈখিক স্কেল

মানচিত্রের উপাদান

যেকোনো মানচিত্রকে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে গেলে কয়েকটি বিষয় বা উপাদান মানচিত্রে থাকা আবশ্যক। সেগুলি হলো —

- **স্কেল** - এর সাহায্যে মানচিত্রের ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করা যায়।
- **অভিক্ষেপ** - এর সাহায্যে মানচিত্রের আকার, আকৃতি, অবস্থান এবং দূরত্বের ঠিক ধারণা পাওয়া যায়।
- **সূচক** - এর সাহায্যে বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ও রঙ দ্বারা মানচিত্রের নানা বিষয়কে সূচিত করা হয়।
- **শিরোনাম** - যেখানে মানচিত্রে প্রদর্শিত বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

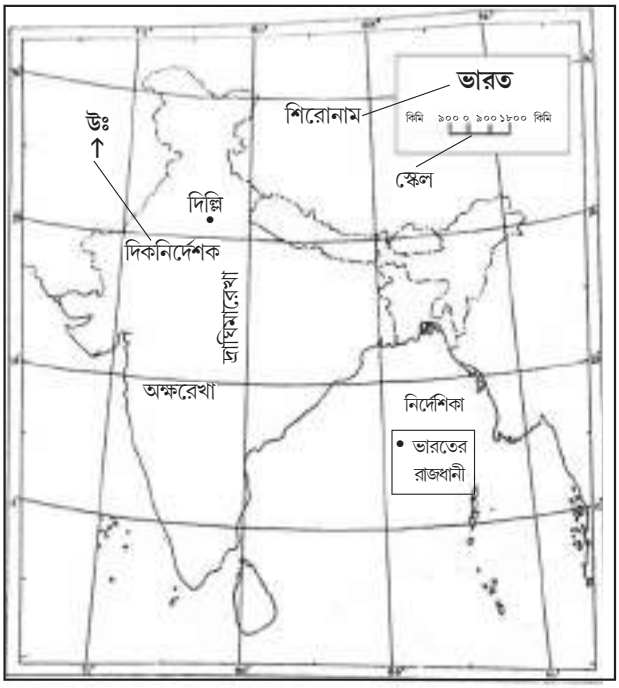

মানচিত্রের উপাদান

◆ **দিকনির্দেশক** - মানচিত্রের উত্তর দিক নির্দেশক তির চিহ্ন। নিম্নে অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে আমরা কোনো একটি মানচিত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা পেতে পারি। তবে মনে রেখো মানচিত্রে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমার উল্লেখ থাকলে উত্তরদিক নির্দেশক (North Line)-এর প্রয়োজন হয় না।

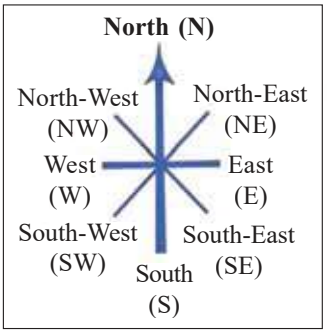

মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ

নানা উদ্দেশ্যে ও বিভিন্ন বিষয় অনুসারে মানচিত্রের শ্রেনিবিভাগ করা হয়।

স্কেলের ভিত্তিতে মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ

- **ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র** (উদাঃ দেয়াল মানচিত্র, স্কেল → ১ : ১,০০০,০০০ বা তার বেশি)
- **মাঝারি স্কেলের মানচিত্র** (উদাঃ ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র স্কেল → ১ : ৫০, ০০০)
- **বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র** (উদাঃ মৌজা মানচিত্র স্কেল → ১ : ৪, ০০০)

তোমরা জানো, মানচিত্রের দূরত্ব ও ভূমিভাগের দুরত্বের মধ্যে অনুপাত হলো মানচিত্রের স্কেল। যদি এই আনুপাতিক হার তুলনামূলক বড়ো হয় তাহলে তা বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র হয়। যেমন – মৌজা মানচিত্র। আবার মানচিত্রের স্কেল ও ভূমিভাগের দূরত্বের আনুপাতিক হার যদি তুলনামূলক ছোটো হয় তবে তা ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র হয়। যেমন – দেয়াল মানচিত্র। মাঝারি ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট এলাকার বিষয়বস্তুকে মাঝারি স্কেলের মানচিত্রে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন - ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র।

এছাড়াও উপস্থাপনের বিষয়বস্তু অনুসারে বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

➢ **রাজনৈতিক মানচিত্র** – পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ, দেশ, রাজ্য তথা জেলার অবস্থান ও সীমানা এই মানচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়।

➢ **প্রাকৃতিক মানচিত্র** – এই মানচিত্রে কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (ভূমিরূপ, নদী, হ্রদ, স্বাভাবিক উদ্ভিদ ইত্যাদি) দেখানো হয়।

➢ **বিষয়ানুগ মানচিত্র** – এই মানচিত্রে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। যেমন – জলবায়ু মানচিত্র, মৃত্তিকা মানচিত্র, পরিবহন মানচিত্র ইত্যাদি।

- **ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র** – এই মানচিত্রে কোনো অঙ্গরাজ্য বা জেলার অংশবিশেষের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়।
- **মৌজা মানচিত্র** – এই মানচিত্রে স্বল্প পরিসর স্থানের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়। মৌজা মানচিত্র ভূমি জরিপের কাজে ব্যবহৃত হয়।

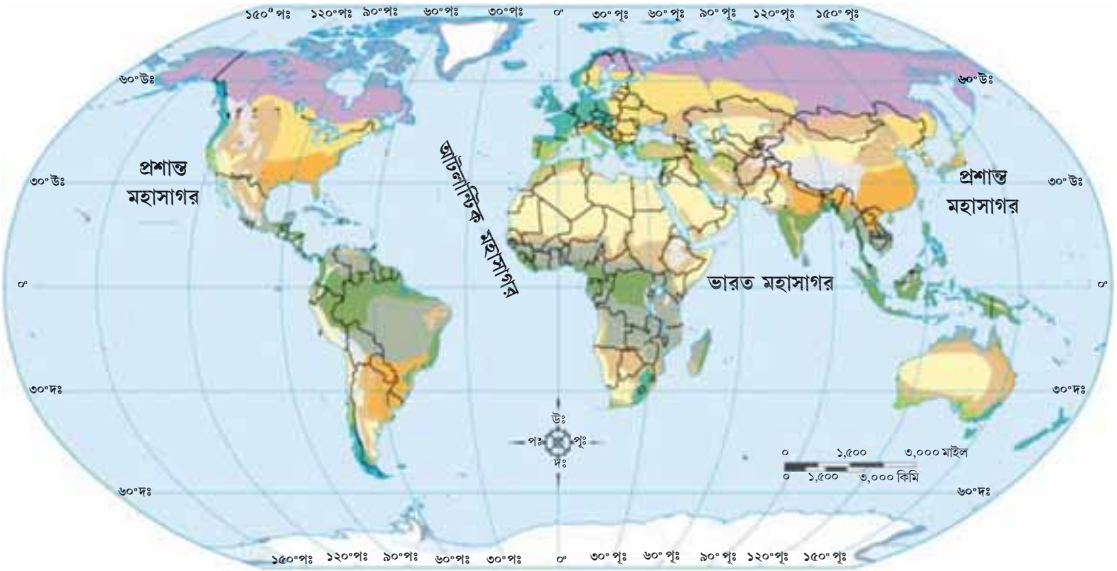

পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল (ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র)

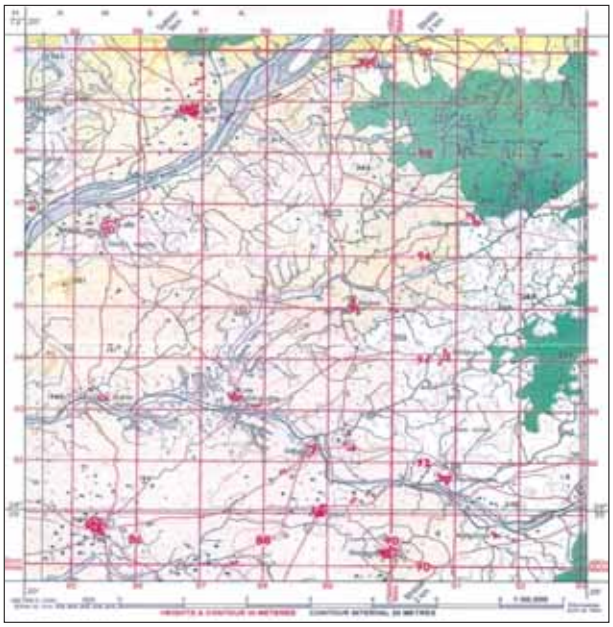

ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র (মাঝারি স্কেলের মানচিত্র)

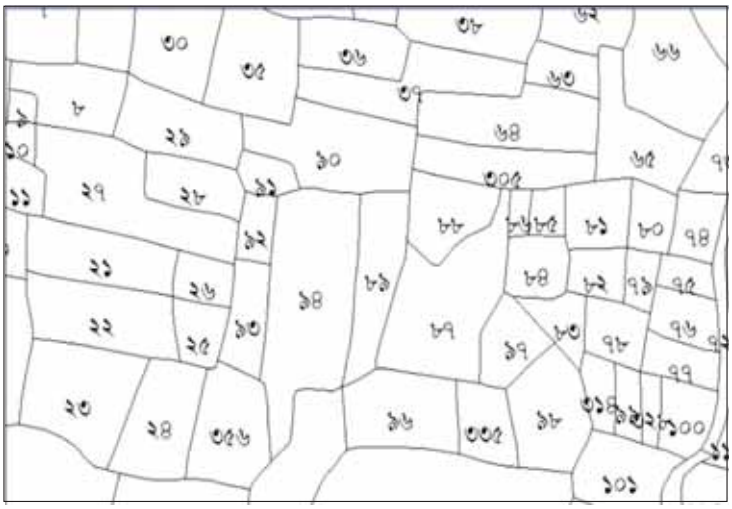

মৌজা মানচিত্র (বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র)

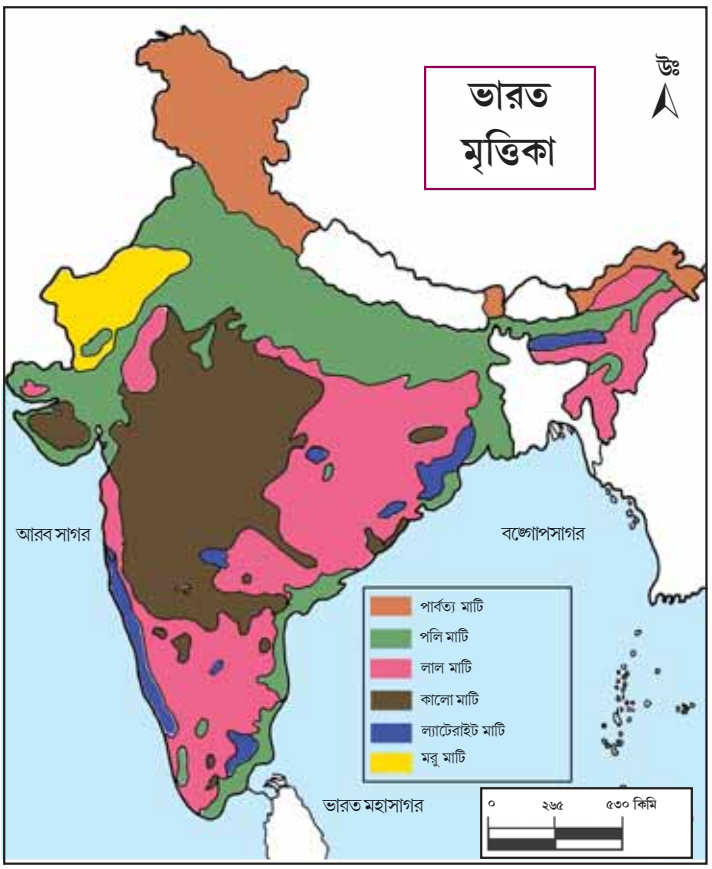

বিষয়ানুগ মানচিত্র

মনে রাখা জরুরি :

- মানচিত্র — ত্রিমাত্রিক ভূদৃশ্যাবলীর দ্বিমাত্রিক চিত্রায়ণ।
- মানচিত্রের স্কেল — মানচিত্র দূরত্ব ও ভূমিভাগের দূরত্বের মধ্যে অনুপাত।
- মানচিত্রবিদ্যা — ভূগোলের যে শাখায় মানচিত্র নির্মাণ, মানচিত্রের স্কেল, উপাদান এবং মানচিত্র তৈরির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তোমরা এই বিষয়ে নবম শ্রেণির 'মানচিত্র ও স্কেল' - অধ্যায়ে বিস্তারিত জানবে।

নমুনা প্রশ্ন

১. বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো :

১.১ পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র আবিষ্কৃত হয় —

ক) রোমে খ) ব্যাবিলনে গ) প্যারিসে ঘ) লন্ডনে

১.২ সাধারণত মানচিত্রের বামদিকটি নির্দেশ করে —

ক) উত্তরদিক খ) দক্ষিণদিক গ) পূর্বদিক ঘ) পশ্চিমদিক

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ একটি বা দুটি শব্দে উত্তর দাও :

২.১.১ মানচিত্রবিদ্যাকে ইংরাজিতে কী বলে?

২.১.২ একটি ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্রের উদাহরণ দাও।

২.১.৩ R.F. কথাটির পুরো অর্থ লেখো।

২.২ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.২.১ পৃথিবীর জলবায়ু মানচিত্র _____ স্কেলের মানচিত্র।

২.২.২ ভূমি ব্যবহার মানচিত্র একটি _____ মানচিত্র।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো :

৩.১ মানচিত্রে স্কেলের গুরুত্ব নিরূপণ করো।

৩.২ মানচিত্রের আবশ্যক উপাদানগুলি কী কী?

৩.৩ বিবৃতিমূলক স্কেল বলতে কী বোঝো?

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর লেখো :

৪.১ একটি ছক বা তালিকার সাহায্যে মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ করো।

নোটস্

নোটস্

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬